Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সুফিবাদ ও আধুনিক সমস্যা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন সুলতানা সুইটি

রোলঃ 23100120210

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সুফিবাদ ও আধুনিক সমস্যা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন সুলতানা সুইটি

রোলঃ 23100120210

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সুফিবাদ ও আধুনিক সমস্যা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন সুলতানা সুইটি, আইডিঃ 23100120210 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সুফিবাদ ও আধুনিক সমস্যা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sharmin Sultana Sweety

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

শারমিন সুলতানা সুইটি

আইডিঃ 23100120210

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ : সুফিবাদ 5

অধ্যায় ২ : সুফিবাদের বিকাশ ও বিবর্তন 34

অধ্যায় ৩ : সুফিবাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা : সুফিবাদ ও শরীয়াহ 48

অধ্যায় ৪ : উপসংহার 51

উৎস/তথ্যসূত্র 53

অধ্যায় ১ : সুফিবাদ

‘সুফি’ শব্দের উৎপত্তি

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ‘সুফিবাদ’ শব্দটি খুব বেশি পরিচিত ছিল না। হামজা ইয়াকুবের (১৯৮৭: ৯) মতে, হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে প্রবেশের পর এই শব্দটি কেবল উলামাদের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে।

সুফিবাদ শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ যুক্তি দেন যে, ইবাদত বিশেষজ্ঞদের জন্য ‘সুফি’ শব্দটি কেবল এক ধরনের উপাধি, কারণ আরবিতে এই শব্দের কোনো মূল নেই। অন্যদিকে, অন্য কিছু লোক এর বিপরীত মত পোষণ করেন, অর্থাৎ আরবিতে ‘সুফিবাদ’ শব্দের একটি মূল রয়েছে।

শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে চারটি প্রধান মত রয়েছে –

১. “আল-শাফা” শব্দের উৎপত্তি, যার ভাষাগত অর্থ পরিষ্কার বা বিশুদ্ধ।

এরও যৌক্তিকতা আছে, কারণ সুফিদের মনোভাব এবং স্বয়ং সুফিবাদ সর্বদা আত্মার পবিত্রতা ও শুচিতার উপর জোর দেয়।

আল-সুহরাওয়ার্দী তাঁর ‘আল-আওয়ারিফ আল-মা'আরিফ’ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আবু সাঈদ আল-খাররাজ (মৃত্যু: ২৬৮ হিজরি)-কে একবার কেউ “সুফি” সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: “সুফিরা হলো এমন লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ পরিশুদ্ধ করেছেন, অতঃপর তাদের অন্তর আলোয় পূর্ণ হয়ে যায়, এবং তারা আল্লাহর যিকির পাঠের মাধ্যমে পরম আনন্দের স্তরে প্রবেশ করে।”
(জালালউদ্দিন রহমত, জার্নাল আল-হিকমাহ, খণ্ড ১১, মুত্তাহারি ফাউন্ডেশন, বান্দুং, ১৯৯৩: পৃ. ৭৭)।

২. তাফতাজানীর গবেষণায় (১৯৮৫: ২১) দেখা যায় যে, কিছু লোক বিশ্বাস করে যে সুফিবাদ শিক্ষার উৎস আহলে শুফফাহ-এর সাথে সম্পর্কিত, যারা হলেন নবীর অনুসারী মুহাজির গোষ্ঠী, যারা মক্কা থেকে মদিনায় গমন করেন, নবীর বারান্দা মসজিদে (শুফফাত আল-মসজিদ) বসবাস করতেন এবং ইলম (দ্বীনের জ্ঞান) অর্জনের জন্য ও দ্বীনের শিক্ষা অনুসারে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনযাপন করেছিলেন।

৩. এম. শরীফ (১৯৮৭: ৩৮) যেমন উল্লেখ করেছেন, আরেকটি মতানুসারে, সুফিবাদ শব্দটি গ্রিক শব্দ 'সোফিয়া' থেকে এসেছে, যার অর্থ প্রজ্ঞা। যেহেতু তারা কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে আত্মা/নফসকে পরিশুদ্ধ করার জন্য অভ্যন্তরীণ আলোকিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করেছিলেন, তাই তাদের সুফি বলা হয়।

৪. এদিকে, ইবনে খালদুন (বৈরুত, n.d: ৩৭০) মনে করেন যে, সুফিবাদ শব্দটি 'শুফ' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ ভেড়ার পশম। সুফিরা সরলতা ও দারিদ্র্যের প্রতীক হিসেবে মোটা পশম বা ভেড়ার লোমের তৈরি পোশাক পরিধান করেন — যা সমৃদ্ধির সময়ে অন্যদের থেকে ভিন্ন।

কিছু পণ্ডিত বলেছেন, এর কারণ হলো তারা 'যুহহাদ' নামে পরিচিত না হয়ে 'সুফি' নামটি গ্রহণ করেছিলেন—কারণ 'যুহহাদ' শব্দটি আত্মপ্রশংসার ইঙ্গিত দিতে পারত। কিন্তু পশম পরিধান করা ছিল একটি বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা, যার মধ্যে আত্মপ্রশংসা জড়িত ছিল না, এবং এর বিপরীত হলো প্রধানত রেশমের তৈরি পোশাক, যা বিলাসিতার প্রতীক এবং সাধারণত ধনী ব্যক্তিরা পরিধান করতেন।

তাসাউউফের ধারণা ও এর গুরুত্ব:
সুফিবাদ ইসলাম ধর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এটি ইসলাম ধর্মের মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছে, এবং এটিকে ইসলামের একটি শাখা, অর্থাৎ সুন্নি বা শিয়ার মতো অন্য কোনো সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।
আমাদের ইতিহাস থেকে এটা খুবই স্পষ্ট, ফিকহে আমাদের চারটি মাযহাব আছে- দ হানাফী, শাফি, মালিকি এবং হাম্বলী, আক্বীদাতে আমাদের অনুরূপ মাযহাব আছে - আল
তাহাবী, মাতুরিদি ও আহসারী এবং তাসাউউফেও আমাদের মাযহাব আছে (বিদ্যালয়) - নকশবন্দী, শাদিলি, রিফাই এবং কাদিরি, অন্যান্য প্রধান বিদ্যালয় আশরাফিয়া, বদাউইয়া, বেক্তাশিয়া, চিশতিয়া, দারকাওয়্যা,
দাসুকিয়া, ফিরদাউসিয়া, খালওয়াতিয়্যা, কুবরাবিয়্যা, মাওলাউইয়া,
সোহরাওয়ার্দীয়া, তিজানিয়্যা এবং ইয়াসাবিয়্যা, সকলের নামকরণ করা হয়েছে একজন আলেমের নামে

যে অঞ্চলে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
যদিও চর্চা, চেহারা ও অভ্যন্তরীণ গঠন ভিন্ন
আদেশ এক থেকে অন্য পরিবর্তিত হতে পারে, থেকে অঞ্চলভেদে তরিকাগুলোর মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই, কারণ চূড়ান্ত লক্ষ্য মূলত একই। ঠিক যেমন আইনশাস্ত্রের বিভিন্ন মাযহাবের পার্থক্যগুলো পদ্ধতির ভিন্নতাকে নির্দেশ করে, ধর্মের মূল সত্তাকে নয়।

উদাহরণস্বরূপ, উসমানীয় খলিফা মুহাম্মদ আল ফাতিহ, যিনি সর্বপ্রথম ঐকমত্যের ভিত্তিতে কনস্টান্টিনোপল জয় করেছিলেন, তিনি ফিকহে (আইনশাস্ত্রে) হানাফি, আকিদায় (বিশ্বাসে) মাতুরিদি এবং তাসাউফে (ইহসানে) নকশবন্দী ছিলেন।

তাহলে, তাসাউফ/সুফিবাদ ধারণাটি কী?
কুরআনে আল্লাহ সূরা আশ-শামসে বলেন –
৭

ْف ٍس َو َما َسَّوا َها
َونَ

আত্মার শপথ, এবং তাকে প্রদত্ত অনুপাত ও শৃঙ্খলার শপথ;

(8

َوا َها
َوتَقْ
ُجو َر َها
َهَمَها فُ
ْ
ل
َ
فَأ

এবং এর ভুল ও সঠিক সম্পর্কে এর জ্ঞানলাভ;-

(9

َح
لَ
فْ

ۡ
ۡ قَ ۡد أ
ۡمن ۡز ۡۡۡكاه
নিশ্চয়ই সে সফলকাম যে একে পরিশুদ্ধ করে, আর সে ব্যর্থ হলে তা এটিকে কলুষিত করে! কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন (২৬:৮৮-৮৯):
ُع ۡما ُل ۡوَل بَنُو ۡن
ۡۡل يَنفۡ
ۡ
يَ ۡوم
ۡب
ۡ
ۡقَل
تَى ا ۡۡۡۡۡلَ ب
ۡ
ۡۡۡل ۡم ۡن أ
ۡس إ ۡلِيمٍ ۡ
(সেই দিন, যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না, কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া, যে আল্লাহর কাছে 'কালবুন সালিম'/একটি সুস্থ অন্তর নিয়ে আসবে।)

আমাদের ঐতিহ্যবাহী উলামাদের মতে অনেক আলেমদের মতামত রয়েছে এবং আমাদের ইসলামী ইতিহাসের প্রাথমিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মাশায়েখগণ, কিন্তু এর সরলীকৃত অর্থে, তাসাউফ ও তাযকিয়াহ মূলত বোঝায়—একটি সুস্থ হৃদয়ে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন ও সুন্নাহতে আমাদের আদেশ করেছেন, এবং এটি একটি শৃঙ্খলা। এটি এমন একটি বিজ্ঞান যা আমাদের দ্বীন আমাদের দান করেছে, অথবা অন্ততপক্ষে এই বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলো দান করেছে, যা মানুষকে বশীভূত করা এবং তাকে তার সর্বোচ্চ অবস্থায়—তার সম্ভাবনাকে পূর্ণতা দানে—নিয়ে আসে।

কারণ, আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ছাড়া—মানুষ বন্য পশু থেকে ভিন্ন কিছু থাকে না। তাযকিয়াহ ছাড়া সে বন্য পশুর মতো হয়ে যায়: লোভী, আক্রমণাত্মক, তাড়াহুড়োকারী, ঈর্ষান্বিত ইত্যাদি। আমাদের ধর্মে তাসাউফ কতটা কেন্দ্রীয়, এবং সামগ্রিকভাবে ইসলামে এর স্থান কোথায়?

সম্ভবত এর সর্বোত্তম উত্তর হলো মুসলিমের হাদিস, যেখানে উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছেন: একদিন আমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বসেছিলাম। এমন সময় ধবধবে সাদা পোশাক ও কুচকুচে কালো চুলের এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এলেন। তাঁর গায়ে ভ্রমণের কোনো চিহ্নই ছিল না, যদিও আমাদের মধ্যে কেউই তাঁকে চিনতাম না।
তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে বসলেন, তাঁর হাঁটুতে নিজের হাঁটু ঠেকিয়ে, হাত দুটি নবীর পায়ের ওপর রেখে বললেন: "মুহাম্মদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।" আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "ইসলাম হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমজানে রোজা রাখা এবং যদি সুযোগ পাও তবে আল্লাহর ঘরে হজ করা।"

তিনি বললেন: "আপনি সত্য বলেছেন," এবং আমরা অবাক হলাম যে তিনি প্রশ্ন করলেন এবং তারপর উত্তরটি যাচাই করে নিলেন। তারপর তিনি বললেন: "আমাকে প্রকৃত ঈমান সম্পর্কে বলুন," এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন: "তা হলো আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর আহূত কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং ভাগ্য, তার ভালো ও মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।"

তিনি বললেন, "আপনি সত্য বলেছেন, এখন আমাকে ঈমানের পূর্ণতা (ইহসান) সম্পর্কে বলুন," এবং নবী (আল্লাহ্ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) উত্তর দিলেন: "তা হলো এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর যদি তাঁকে নাও দেখো, তবুও তিনি তোমাকে দেখছেন।"

তারপর সেই আগন্তুক চলে গেলেন। আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, এবং নবী (আল্লাহ্ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) আমাকে বললেন, "উমর, তুমি কি জানো প্রশ্নকারী কে ছিল?" এবং আমি উত্তর দিলাম, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন।" তিনি বললেন,

“তিনিই ছিলেন জিব্রাইল, যিনি তোমাদের কাছে তোমাদের ধর্ম শিক্ষা দিতে এসেছিলেন” (সহীহ মুসলিম,
১.৩৭: হাদিস ৮)।
এটি একটি সহীহ হাদিস, যাকে ইমাম নাওয়াভী সেইসব হাদিসগুলোর অন্যতম হিসেবে বর্ণনা করেছেন যার উপর ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এর শেষ শব্দগুলোতে ‘আতাকুম ইউ‘আল্লিমুকুম দিনাকুম’, অর্থাৎ “তোমাদের কাছে তোমাদের ধর্ম শিক্ষা দিতে এসেছিলেন”-এ ‘দীন’ শব্দটির ব্যবহার এই ইঙ্গিত দেয় যে, ইসলাম ধর্ম হাদিসে উল্লিখিত তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গঠিত: ইসলাম, অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের কাছে যা চান তার বাহ্যিক আনুগত্য; ঈমান, বাঅদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস, যা নবীগণ আমাদের জানিয়েছেন; এবং ইহসান, অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করা যেন তাঁকে দেখা যায়।
কুরআন সূরা মারইয়ামে বলে:
“নিশ্চয়ই আমি স্মরণ অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি তা সংরক্ষণ করব” (কুরআন ১৫:৯),
এবং আমরা যদি চিন্তা করি যে আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞায় কীভাবে এটি সম্পন্ন করেছেন, আমরা দেখতে পাই যে এটি করেছেন মানুষের মাধ্যমে, অর্থাৎ সেইসব ঐতিহ্যবাহী আলেমদের মাধ্যমে যাদেরকে তিনি ধর্মের প্রতিটি স্তরে প্রেরণ করেছেন। ইসলামের স্তরটি আমাদের কাছে সংরক্ষিত ও পৌঁছে দিয়েছেন শরীয়াহ বা ‘পবিত্র আইন’ এবং এর আনুষঙ্গিক অনুশাসনসমূহের ইমামগণ; ঈমানের স্তরটি আকীদা বা ‘বিশ্বাসের মূলনীতিসমূহের’ ইমামগণ; এবং ইহসানের স্তর, অর্থাৎ “আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করা যেন তাঁকে দেখা যায়,” তাসাউফের ইমামগণ।

হাদিসের ‘আল্লাহর ইবাদত করা’ কথাটিই আমাদের এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখিয়ে দেয়, কারণ ‘ইবাদত’ করার পদ্ধতি কেবল ইসলামের বাহ্যিক বিধানের মাধ্যমেই জানা যায়, আর এই ইবাদতের বৈধতার জন্য প্রয়োজন ঈমান বা আল্লাহ এবং ইসলামী ওহীর প্রতি বিশ্বাস, যা ছাড়া ইবাদত নিষ্ফল অঙ্গভঙ্গি মাত্র; অপরদিকে, ‘যেন তুমি তাঁকে দেখছ’ কথাটি দেখায় যে, ইহসান একটি মানবিক পরিবর্তনকে বোঝায়, কারণ এর মধ্যে এমন এক অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে যা আমাদের বেশিরভাগের কাছেই অধরা। সুতরাং তাসাউফকে বুঝতে হলে, আমাদের

অবশ্যই ইসলাম ও ঈমান উভয়ের সাপেক্ষে এই পরিবর্তনের প্রকৃতিকে দেখতে হবে, এবং আজ রাতে আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু এটাই।
ইসলামের স্তরে আমরা বলেছি যে, তাসাউফের জন্য ইসলামের প্রয়োজন, 'পবিত্র আইনের বিধান মেনে চলার' মাধ্যমে। কিন্তু ইসলামও একইভাবে তাসাউফকে দাবি করে।

কেন? এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, মুসলমানদেরকে যে সুন্নাহ অনুসরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা শুধু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা ও কাজই নয়, বরং তাঁর বিভিন্ন অবস্থাও বটে; হৃদয়ের বিভিন্ন অবস্থা, যেমন— তাকওয়া (আল্লাহভীতি), ইখলাস (আন্তরিকতা), তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর নির্ভরতা), রাহমা (দয়া), তাওয়াদু (নম্রতা) ইত্যাদি।
এখন, ইসলামী নৈতিকতা ও ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, মানুষের কর্মকে নৈতিকতার কেবল দুটি স্তরে—সঠিক বা ভুল—বিভক্ত করা হয় না; বরং পরকালে তার পরিণতির ক্রমানুসারে পাঁচটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়। ফরয (ওয়াজিব) হলো তা, যার সম্পাদনের জন্য আল্লাহ পরকালে পুরস্কার প্রদান করেন এবং যা সম্পাদন না করার জন্য শাস্তি প্রদান করেন।
সুন্নাহ—সম্পাদনকারী পুরস্কৃত হবেন, এবং বৈধ কারণ ছাড়া অসম্পাদনকারী শাস্তি পাবেন।

এরপর মুস্তাহাব (মানদুব) হলো তা, যার সম্পাদনের জন্য পুরস্কার রয়েছে, কিন্তু অসম্পাদনের জন্য শাস্তি নেই।
জাতের (মুবাহ) কাজটি পুরস্কার বা শাস্তি কোনোটির সাথেই সম্পর্কহীন।
মাকরুহ (অপরাধ) হলো তা, যার অসম্পাদনের জন্য পুরস্কার রয়েছে কিন্তু সম্পাদনের জন্য শাস্তি নেই।
হারাম (অবৈধ) হলো তা, যার অসম্পাদনের জন্য পুরস্কার রয়েছে এবং সম্পাদনের জন্য শাস্তি রয়েছে, যদি কেউ তওবা না করে মারা যায়।

কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের কাছে হৃদয়ের মানবিক অবস্থাগুলোকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে, যা এই প্রতিটি শিরোনামের অধীনে আসে। তবুও ফিকহ বা 'ইসলামী

আইনশাস্ত্র'-এর কিতাবগুলোতে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় না, কারণ সালাত, যাকাত বা রোজার মতো এগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণে পালনীয় নয়।

কিন্তু যদিও এগুলো গণনাযোগ্য নয়, তবুও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসুন কয়েকটি উদাহরণ দেখি -
(১) আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা। কুরআনের সূরা আল-বাক্বারায়, আল্লাহ তাদের তিরস্কার করেন যারা আল্লাহর সাথে এমন কাউকে অংশীদার করে যাদেরকে তারা আল্লাহর মতোই ভালোবাসে। তারপর তিনি বলেন,
"আর মুমিনরা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় অধিক" (কুরআন ২:১৬৫), যা মুমিন হওয়ার শর্ত হিসেবে অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে আল্লাহর প্রতি অধিক ভালোবাসাকে নির্ধারণ করে।(২) দয়া। বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি কোনো দয়া দেখাবেন না" (সহীহ মুসলিম, ৪.১৮০৯: হাদিস ২৩১৯), এবং তিরমিযী একটি উত্তম (হাসান) হাদিস বর্ণনা করেন, "অভিশপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো থেকে দয়া কেড়ে নেওয়া হয় না" (আল-জামি' আস-সহীহ, ৪.৩২৩: হাদিস ১৯২৩)।

(৩) পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা। মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনো, এবং তোমাদের কেউই ঈমান আনতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো..." (সহীহ মুসলিম, ১.৭৪: হাদিস ৫৪)।

(4) সালাতে (নামাজ) একাগ্রতা। আবু দাউদ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেন যে, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছেন, "নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি যখন চলে যায়, তখন তার কোনো সালাতই তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয় না, ...তবে তার দশ ভাগের এক ভাগ, নয় ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ এবং অর্ধেক বাদে" (সুনান আবি দাউদ, ১.২১১: হাদিস ৭৯৬)—

এর অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তির সালাত তার জন্য গণনা করা হয় না, শুধুমাত্র সেই সালাত ছাড়া, যেটিতে সে তার অন্তরে আল্লাহর সাথে একাগ্র থাকে।

(5) নবীর প্রতি ভালোবাসা। বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার পুত্র এবং সকল মানুষের চেয়েও অধিক প্রিয় হই" (ফাতহ আল-বারি, ১.৫৮, হাদিস ১৫)।

এই আয়াতগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, উল্লেখিত কোনো অবস্থাই—তা দয়া, ভালোবাসা বা উপস্থিত বুদ্ধিই হোক না কেন—পরিমাপযোগ্য নয়। কারণ শরীয়ত এটা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে না যে, কাউকে অবশ্যই "দুই দফা দয়া করতে হবে" বা "তিন দফা উপস্থিত বুদ্ধি থাকতে হবে", যেভাবে নামাজের রাকআতের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যায়। অথচ এগুলোর প্রত্যেকটিই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ফরজ। আসুন, হারাম বা 'কঠোরভাবে অবৈধ' এমন কয়েকটি অবস্থার উদাহরণ দেখে চিত্রটি সম্পূর্ণ করা যাক:
(১) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করা। আল্লাহ তাআলা কুরআনের সূরা আল-বাক্বারাতে বলেন,
"এবং আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করো, আমি তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করব—এবং শুধু আমাকেই ভয় করো" (কুরআন ২:৪০), যার শেষ বাক্যটি, ইমাম ফখর আল-দীন আল-রাযীর মতে, "এটি প্রতিষ্ঠা করে যে, মানুষ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতে বাধ্য নয়" (তাফসীর আল-ফখর আল-রাযী, ৩.৪২)।

(২) নিরাশা। আল্লাহ তাআলা বলেন,
"অবিশ্বাসীগণ ব্যতীত আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না" (কুরআন ১২:৮৭), যা এই অভ্যন্তরীণ অবস্থার অবৈধতা নির্দেশ করে, এটিকে মানুষের সম্ভাব্য নিকৃষ্টতম অবস্থা, অর্থাৎ অবিশ্বাসের সাথে যুক্ত করে।

(৩) অহংকার। মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যার অন্তরে এক কণা পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না" (সহীহ মুসলিম, ১.৯৩: হাদিস ৯১)।

(৪) ঈর্ষা, অর্থাৎ অন্যের প্রাপ্ত নেয়ামত হারানোর কামনা করা। আবু দাউদ বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,
"হিংসা থেকে সাবধান, কারণ ঈর্ষা নেক আমলকে এমনভাবে ভস্ম করে, যেমন আগুন কাঠকে ভস্ম করে" (সুনান আবি দাউদ, ৪.২৭৬: হাদিস ৪৯০৩)।

(৫) ইবাদতের কাজে লোক দেখানো। আল-হাকিম একটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নেক আমলে সামান্যতম লোক দেখানোও এমন, যেন আল্লাহর সাথে অন্যের ইবাদত করা হচ্ছে...।" (আল-মুস্তাদরাক 'আলা আল-সহিহাইন, ১.৪)।

এই এবং অনুরূপ হারাম অভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলো ফিকহ বা 'আইনশাস্ত্রের' কিতাবসমূহে পাওয়া যায় না, কারণ ফিকহ কেবল বিধানের পরিমাণযোগ্য বর্ণনা নিয়েই আলোচনা করে। বরং, এগুলোর কারণ ও প্রতিকার পরীক্ষা করা হয়।তাসাউউফের 'অভ্যন্তরীণ ফিকহ'-এর পণ্ডিতগণ, যেমন ইমাম আল-গাজ্জালী তাঁর 'ইহইয়া উলুম আল-দিন' [ধর্মীয় জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন]-এ, ইমাম আল-রাব্বানী তাঁর 'মাকতুবাত' [চিঠিপত্র]-এ, আল-সুহরাওয়ার্দী তাঁর 'আওয়ারিফ আল-মা'আরিফ' [আলোকিতদের জ্ঞান]-এ, আবু তালিব আল-মাক্কি তাঁর 'কুতুল কুলুব' [হৃদয়ের প্রতিপালন]-এ এবং এই জাতীয় অন্যান্য ধ্রুপদী গ্রন্থসমূহে, অন্তরের জীবন সম্পর্কিত শত শত নৈতিক প্রশ্নের আলোচনা ও সমাধান করা হয়েছে। এগুলো শরীয়তের গ্রন্থ এবং এগুলোর প্রশ্নগুলো পবিত্র আইনের প্রশ্ন—একজন মুসলমানের জন্য কী হালাল বা হারাম, সেই সম্পর্কিত; এবং এগুলো নবুয়তি সুন্নাহর সেই অংশকে সংরক্ষণ করে যা অবস্থা সম্পর্কিত।
এই ধরনের তথ্যের প্রয়োজন কার?

সকল মুসলমান, কারণ কুরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদীসসমূহ এই সত্যের দিকেই ইঙ্গিত করে যে, একজন মুসলমানকে শুধু নির্দিষ্ট কিছু কাজ ও কথা বললেই চলবে না, বরং তাকে বিশেষ কিছু হতে হবে, হৃদয়ের নির্দিষ্ট কিছু অবস্থা অর্জন করতে হবে এবং অন্য কিছু বর্জন করতে হবে। আমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কখনো ভয় করি? আমাদের অন্তরে কি এক কণা অহংকারও আছে? নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি আমাদের ভালোবাসা কি অন্য কোনো মানুষের প্রতি ভালোবাসার চেয়ে বেশি? আমাদের সৎকর্মে কি সামান্যতম লোকদেখানো ভাবও আছে?
আধ মিনিটের চিন্তাভাবনাই একজন মুসলমানকে দেখিয়ে দেবে যে, তার দ্বীনের এই দিকগুলোতে তার অবস্থান কোথায়, এবং কেন প্রাচীন যুগে মুসলমানদের এই অবস্থাগুলো অর্জনে সাহায্য করার দায়িত্ব আনাড়িদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি, বরং তা হৃদয়ের উলামা, অর্থাৎ ইসলামী তাসাউফের আলেমদের উপর অর্পণ করা হয়েছিল।

অধিকাংশ মানুষের জন্য এই পরিবর্তনগুলো আনা সহজ নয়, কারণ অভ্যাসের বশে, যে সূক্ষ্মতার সাথে আমরা নিজেদেরকে ধোঁকা দিতে পারি তার কারণে,
কিন্তু সর্বোপরি কারণ আমাদের প্রত্যেকেরই একটি অহং, সত্তা, 'আমি' আছে, যাকে আরবিতে 'আল-নফস' বলা হয়, এবং সূরা ইউসুফে আল্লাহ এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন: "নিশ্চয়ই সত্তা সর্বদা মন্দ কাজের আদেশ দেয়" (কুরআন ১২:৫৩)।
মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তা বিবেচনা করুন, যে:

"পুনরুত্থানের দিনে সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হবে যুদ্ধে শহীদ হওয়া একজন ব্যক্তি।" তাকে হাজির করা হবে, আল্লাহ তাকে তাঁর প্রাপ্ত অনুগ্রহসমূহের কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং লোকটি তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ বলবেন, "তুমি সেগুলো দিয়ে কী করেছ?" উত্তরে লোকটি বলবে, "আমি আপনার জন্য জীবন দিয়ে যুদ্ধ করেছি।"

আল্লাহ জবাব দেবেন, “তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি বীর হিসেবে পরিচিত হওয়ার জন্য যুদ্ধ করেছ, এবং তা ইতোমধ্যেই বলা হয়ে গেছে।” তারপর তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে পবিত্র জ্ঞান অর্জন করেছে, তা অন্যদের শিখিয়েছে এবং কোরআন তেলাওয়াত করেছে। আল্লাহ তাকে তাঁর প্রাপ্ত অনুগ্রহসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং লোকটি তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ বলবেন, “তুমি সেগুলো দিয়ে কী করেছ?” উত্তরে লোকটি বলবে, “আমি পবিত্র জ্ঞান অর্জন করেছি, তা শিখিয়েছি এবং কোরআন তেলাওয়াত করেছি, আপনারই সন্তুষ্টির জন্য।” আল্লাহ বলবেন, “তুই মিথ্যাবাদী। তুই জ্ঞান অর্জন করেছিস যাতে তোকে পণ্ডিত বলা যায়, এবং কোরআন পড়েছিস যাতে তোকে তেলাওয়াতকারী বলা যায়, আর যা বলা হয়েছে তা তো আগেই বলা হয়েছে।” তারপর সেই লোকটিকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যাকে আল্লাহ উদারভাবে জীবিকা দিয়েছেন, তাকে নানা প্রকার সম্পদ দান করেছেন, এবং আল্লাহ তাকে প্রদত্ত অনুগ্রহগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন, আর লোকটি তা স্বীকার করবে, তখন আল্লাহ বলবেন, “আর তুমি সেগুলো দিয়ে কী করেছ?” লোকটি উত্তর দেবে, “আপনি যে ধরনের ব্যয় দেখতে ভালোবাসেন, তার একটিও আমি বাকি রাখিনি, যা আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করিনি।”

আল্লাহ বলবেন, “তুই মিথ্যাবাদী। তুই এটা করেছিস যাতে তোকে উদার বলা যায়, আর যা বলা হয়েছে তা তো আগেই বলা হয়েছে।” তারপর তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।” (সহীহ মুসলিম, ৩.১৫১৪: হাদিস ১৯০৫)।এবং আমাদের বেশিরভাগের জন্য, এটি আমাদের কাজ করার সমগ্র প্রেরণাকে আচ্ছন্ন ও প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু যখন শৈশব শেষ হয় এবং আমরা ইসলামে প্রাপ্তবয়স্ক হই, তখন ধর্ম আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয়, উপরোক্ত হাদিসের মাধ্যমে এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই

কথার মাধ্যমে যে, "সৎকর্মে সামান্যতম লোকদেখানোও আল্লাহর সাথে অন্যের উপাসনা করার সমান", যে অন্যের চিন্তাভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া আর যথেষ্ট নয়, এবং আমাদের অবশ্যই আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে হবে, এবং অতঃপর শুধুমাত্র আল্লাহর আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে হবে।
কুরআনের পূর্বোক্ত আয়াত এবং হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে, অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি বা তাযকিয়াহ বাহ্যিক শরীয়তের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।
এখন, ইসলামী প্রত্যাদেশ এইভাবে মুসলিমকে বলে যে তার চিন্তাভাবনা এবং প্রেরণার অভ্যাসগুলো ভাঙা বাধ্যতামূলক, কিন্তু কীভাবে তা করতে হবে তা বলে না। এর জন্য,
তাকে অবশ্যই এই রাষ্ট্রগুলোর আলেমদের কাছে যেতে হবে, কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে,
"যদি না জানো, তবে যারা জানে তাদের জিজ্ঞাসা করো" (কুরআন : ১৬:৪৩),
এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই পরিবর্তন আনা, মুসলমানদেরকে আধ্যাত্মিক আন্তরিকতার দিকে নিয়ে এসে পরিশুদ্ধ করা,
নবী মুহাম্মদ (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)-এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল, কারণ আল্লাহ কুরআনের
সূরা আল 'ইমরানে বলেন,
"আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদের উপর বরকত দিয়েছেন, নিশ্চয়ই তিনি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর নিদর্শনাবলী পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন" (কুরআন ৩:১৬৪),
যা নবুয়তের মিশনের চারটি কাজ স্পষ্টভাবে তালিকাভুক্ত করে, যার দ্বিতীয়টি, 'ইউযাক্কিহিম'-এর অর্থ হলো সুনির্দিষ্টভাবে 'তাদেরকে পরিশুদ্ধ করা' এবং এর অন্য কোনো আভিধানিক অর্থ নেই।"এবং তার পথ অনুসরণ করো, যে আমার দিকে ফিরে আসে" (কুরআন ৩১:১৫)।

এই আয়াতগুলো তাদের শিক্ষাদান ও রূপান্তরকারী ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়, যারা মুসলমানদের কাছে ইসলামী প্রত্যাদেশ পৌঁছে দেন। এবং দ্বিতীয় আয়াতে 'ইত্তিবা' শব্দটির ব্যবহার, যা আরও সাধারণ, তা একজন শিক্ষকের সঙ্গ রাখা এবং তাঁর

আদর্শ অনুসরণ করা উভয়কেই বোঝায়। এ কারণেই তাসাউউফের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, যদিও অনেক পদ্ধতি ও চিন্তাধারা ছিল, এই দুটি জিনিস কখনও পরিবর্তিত হয়নি: একজন শিক্ষকের সঙ্গ রাখা এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা—ঠিক একইভাবে যেভাবে সাহাবাগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গ রেখে এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে উন্নত ও পরিশুদ্ধ হয়েছিলেন।

এবং এ কারণেই তাসাউউফের শৃঙ্খলা বিভিন্ন তরিকা বা কোনো নির্দিষ্ট গুরুর অধীনে থাকা ছাত্রদলের মাধ্যমে সংরক্ষিত ও প্রচারিত হয়ে আসছে। প্রথমত, কারণ এটি ছিল কুরআনে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিশুদ্ধিকরণের সুন্নাহ। দ্বিতীয়ত, ইসলামী জ্ঞান কখনোই শুধু লিখিত লিপি দ্বারা সঞ্চারিত হয়নি, বরং উলামাগণ থেকে ছাত্রদের কাছে সঞ্চারিত হয়েছে। তৃতীয়ত, আলোচ্য জ্ঞানের প্রকৃতি হলো হাল বা 'অবস্থা', শুধু জানা নয়, এবং একারণে এটি ধারাবাহিকভাবে জীবিত উস্তাদদের কাছ থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন, কারণ ওহী দ্বারা প্রয়োজনীয় হৃদয়ের অবস্থাগুলোর ব্যাপকতা ও সংখ্যা কার্যকরভাবে একজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত উদাহরণের অনুকরণকে সঞ্চারণের একমাত্র কার্যকর মাধ্যম করে তোলে।

এখন পর্যন্ত আমরা ইসলামের প্রেক্ষাপটে তাসাওউফ সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যা একটি শরীয়াহ বিজ্ঞান এবং যা জীবনে পবিত্র আইনকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে এবং কুরআন ও হাদিস দ্বারা নির্দেশিত হৃদয়ের অবস্থাগুলো অর্জন করতে অপরিহার্য। শরিয়াহ ও তাসাউফের মধ্যকার এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি মালিকি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মালিকের এই উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায় যে, "যে ব্যক্তি পবিত্র শরীয়ত শিক্ষা না করে তাসাউফ চর্চা করে, সে তার ঈমানকে কলুষিত করে; আর যে ব্যক্তি তাসাউফ চর্চা না করে পবিত্র শরীয়ত শিক্ষা করে, সে নিজেকেই কলুষিত করে। একমাত্র সেই ব্যক্তিই সত্যবাদী প্রমাণিত হয়, যে এই দুটিকে একত্রিত করে।" এই কারণেই মালয়েশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের মাদ্রাসাগুলোতে ঐতিহ্যবাহী পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে তাসাউফ শিক্ষা দেওয়া হতো।সুফিবাদের ঐতিহাসিক উৎস:

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত 'সুফিবাদ' শব্দটি খুব বেশি পরিচিত ছিল না। হামজা ইয়াকুবের (১৯৮৭: ৯) মতে, হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে প্রবেশের পর এই শব্দটি কেবল উলামাদের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে।
আল-কুশাইরি (১৩৩০ হিজরি: ৭) তাঁর 'আল-রিসালা আল-কুশাইরিয়াহ' নামক গ্রন্থে জোর দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর বন্ধু এবং পরবর্তী প্রজন্মের (তাবেঈন) সদস্যরা নিজেদের বন্ধু (রাসূল) বলে সম্বোধন করতে পছন্দ করতেন, কারণ তিনি এটিকে একটি সম্মান হিসেবে বিবেচনা করতেন। তাই, তাঁর মতে, আবিদ, নাসিক, যাহিদ এবং সুফি (ইবাদত বিশেষজ্ঞদের জন্য) এর মতো শব্দগুলো এই প্রজন্মের পরেই পরিচিতি লাভ করে।

ঐতিহাসিকভাবে এর উৎস: কখন তা ঘটেছিল, কেন তা ঘটেছিল এবং কীভাবে তা ঘটেছিল।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং প্রাথমিক খলিফাদের সময়ের পর, ইসলামের বিস্তারে এক ধরনের স্থবিরতা দেখা দেয়। এটি অলৌকিকভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছিল। একশ বছরের মধ্যেই ইসলাম প্যারিস থেকে ১০০ কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে পৌঁছে গিয়েছিল।

ফলে মুসলমানদের জন্য সমৃদ্ধির এক বিস্ফোরণ ঘটে। সমৃদ্ধির কুফলগুলো এই উম্মতের একটি দলকে, এমনকি প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই, সেইসব কুফলের শিকার হতে শুরু করায়—এমনকি ইসলামের বাধ্যবাধকতাগুলো অবহেলা করা পর্যন্ত।

এবং সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে, যারা বাহ্যিকভাবে ধার্মিক—কিংবা তার চেয়েও বেশি ধার্মিক—তাদের মধ্যেও একই ধরনের অবহেলা দেখা দেয়। তারা বাহ্যিক কাজকর্ম (শরীয়াহ)—অর্থাৎ বাইরের দিক—এর উপর অতিরিক্ত জোর দিতে শুরু করে এবং ভেতরের দিকগুলো—যেমন আন্তরিকতা, দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহর উপর আস্থা, নির্ভরতা এবং অন্বেষণ—অবহেলা করতে থাকে।সুতরাং এই উম্মাহর একদল আলেম খুব সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। এটি বিকেন্দ্রীভূতভাবে ঘটলেও, তাঁরা এই প্রবণতাগুলোকে প্রতিহত করার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করার কারণে পরিচিতি

লাভ করেন: বস্তুবাদিতার প্রবণতা এবং সেইসাথে অন্তরের কাজগুলোকে অবহেলা করে বাহ্যিকতার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার প্রবণতা।

তাঁরা এই নেতিবাচক প্রবণতাগুলোকে প্রতিহত করার উপর মনোযোগ দেওয়ার এবং অন্যদেরকেও এগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য আহ্বান জানানোর উপর জোর দিয়েছিলেন। সুতরাং কার্যকরভাবে, তাঁরা উম্মাহকে বলছিলেন যে, তারা ইসলামের কিছু মূল্যবান ও বাধ্যতামূলক অনুশীলন ভুলে গেছে বা অবহেলা করছে, আর সেগুলো হলো—কর্মে উৎকর্ষ (ইহসান), দৃঢ় বিশ্বাস (দৃঢ় ইয়াকীন), আল্লাহর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল), যুহদ—এই দুনিয়ার প্রতি উদাসীন থাকা (যা আল্লাহর কাছে প্রিয়: যে তুমি এই বস্তুগত বা পার্থিব জীবনে মুগ্ধ বা আবিষ্ট নও)...।

সুফিবাদ সর্বপ্রথম (একটি আনুষ্ঠানিক রূপে) অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদ ও বসরার মতো জায়গায় এবং সাধারণভাবে নবগঠিত ইসলামী সাম্রাজ্য বা সভ্যতা জুড়ে আবির্ভূত হয়। তথাকথিত সুফিরা, যদিও সেই সময়ে সর্বজনীনভাবে এই নামে পরিচিত ছিলেন না, ইসলাম ধর্ম এবং এর উৎস—কুরআন ও হাদিসকে—তাদের সূচনা বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তারপর এমন কঠোর তপস্যা ও ত্যাগের অনুশীলন গড়ে তোলেন যার লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ককে গভীর করা এবং আত্মাকে পার্থিবতা ও পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করা।

এবং এই লোকেরা অবশেষে ঐতিহাসিকভাবে কয়েকটি নামে পরিচিত হন।

তাদেরকে 'যুহহাদ'—অর্থাৎ তপস্বী—বলা হতো, যা 'যুহদ' থেকে এসেছে। কখনও কখনও তাদেরকে 'ফুকারা' (দরিদ্র) বলা হতো, কিন্তু এটি আল্লাহর প্রতি ইঙ্গিত করে—যে আল্লাহর সামনে সমস্ত সৃষ্টিই দরিদ্র। বাস্তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আগে আমাদের কিছুই নেই। কিন্তু তারা সুফি হিসেবেই সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেন।

কিন্তু এটাই ছিল সেই সময় যখন তাসাউফের চর্চা অবশেষে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

তবে তাসাউফের চর্চা মূলত এসেছে স্বয়ং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা সাহাবীদের চর্চা থেকে।

পূর্ববর্তী সময়ে, তাসাউফ/সুফিবাদ ছিল নামহীন এক বাস্তবতা। সাহাবীগণ এবং প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা (সালাফ) তাসাউফ শব্দটি ব্যবহার করতেন না (এবং তা করা কোনো নিন্দনীয় বিদআতও নয়!), কিন্তু তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে এর শিক্ষাগুলো পালন করতেন। তারা শায়খ বা আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতেন না।আদেশ-নির্দেশ (তরিকা) এবং এই জাতীয় বিষয় নিয়ে কাজ করার পরিবর্তে, তারা তাদের অন্তর (তাযকিয়া) নিয়ে কাজ করতেন এবং ঘৃণা, শত্রুতা, অহংকার, লোকদেখানো আচরণ, মন্দ ধারণা, সন্দেহ, অন্যের বিচার করা, দোষ খোঁজা, খ্যাতি ও সম্পদের লোভ ইত্যাদির মতো নিন্দনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে একে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাদের ছিল অনুকরণীয় অন্তর, যা আধ্যাত্মিকতা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) প্রতি ভালোবাসা এবং পরস্পরের প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ছিল।
আজ দুঃখজনকভাবে, তাসাউফ কেবল একটি নাম, কিন্তু এর বাস্তবতা খুব কম লোকেরই আছে। অনেকে তাসাউফের প্রবক্তা বলে দাবি করে, কিন্তু তারপর সেই সমস্ত পাপ করে যা দূর করার জন্য তাসাউফ এসেছিল, যেমন—ঝগড়া, বিভেদ, গোষ্ঠী, অন্যের প্রতি ঈর্ষা, খ্যাতির লোভ, "আমার শায়খ বনাম তোমার শায়খ", "আমার দল তোমার দলের চেয়ে ভালো।" তাসাউফ মূলত নিজের অন্তরের উপর কাজ করার বিষয়, এবং কে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত, তা নিয়ে কম ভাবার বিষয়! আসুন আমরা তাসাউফের আসল বার্তায় ফিরে আসি।
সুফিবাদ নিয়ে গবেষণা করেছেন এমন অনেক প্রাচ্যবিদ বলতে চান যে, ইসলামী সুফিবাদের উৎস খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসবাদ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিল।
কেউ কেউ বলতে চান যে, সুফিবাদ আসলে ইসলামেরও পূর্ববর্তী; সুফিবাদ হলো এক ধরনের প্রাচীন আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যা কেবল ইসলাম ধর্ম দ্বারা আত্মীকৃত বা সংশোধিত হয়েছিল।
তাফতাজানির মতে, সুফিবাদ এবং বিভিন্ন ধরনের বিদেশী রহস্যবাদের মধ্যেকার সাদৃশ্যগুলো অহেতুকভাবে এই অর্থ বহন করে যে, সুফিবাদের ধারণাগুলো অন্যান্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, তার মতে, যা অধিকতর সঠিক তা হলো,

সুফিবাদের ধারণাটি স্বয়ং মুসলিমদের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, কারণ তাদের জ্ঞান তাদের নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টি এবং উপলব্ধি থেকে উৎপন্ন হয়। অনেক হাদিস ও কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে যে, সুফিবাদ স্বয়ং ইসলামের শিক্ষা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

কিন্তু সুফিবাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনুশীলনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে, এবং এর কিছু বৈধ কারণও থাকতে পারে –
এটা অস্বীকার করা খুব কঠিন হবে যে, আজ আমরা যাকে সুফিবাদ বলি তার কিছু দিক নবী মুহাম্মদের (সা.) মিশনের আগেও কোনো না কোনো রূপে বিদ্যমান ছিল।এখানে বিবেচনা করার মতো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সুফিরা বা মুসলমানরা নিজেরা এর সাথে অগত্যা দ্বিমত পোষণ করবেন না। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী বিশ্বাসের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো এই ধর্ম মুহাম্মদেরও আগে থেকে বিদ্যমান ছিল। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ইতিহাসের বিভিন্ন নবীর কাছে একই বার্তা পাঠিয়েছেন, যার মধ্যে মুসা এবং ঈসার মতো নবীরাও রয়েছেন, এবং ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে আমরা যে কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাই, তা এই সত্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।
ইসলামের শিক্ষা, এবং সেই সূত্রে সুফিবাদ, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগে এবং একেবারে আদম (আঃ) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সুতরাং, সুফিবাদ ইসলামের আগে বিদ্যমান ছিল—এই যুক্তিটি প্রায়শই ইসলামী ঐতিহ্যের ভেতর থেকেই এইভাবে খণ্ডন করা হয়। অবশ্যই, এটি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল, কারণ ইসলাম নিজেই বিদ্যমান ছিল।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ কর্তৃক তাসাউফের ভারসাম্যপূর্ণ অনুশীলন:
ইসলাম একটি মধ্যযুগীয় ধর্ম (ওয়াসাত)। ইবনে তামিয়াহর মতে, মধ্যবর্তী অবস্থান (ওয়াসাত) হলো একদিকে আইনানুগ ও অত্যন্ত সামাজিক ইহুদি ধর্ম এবং অন্যদিকে অত্যন্ত আধ্যাত্মিক খ্রিস্টধর্মের মধ্যবর্তী অবস্থান। খ্রিস্টধর্ম আধ্যাত্মিক গভীরতা ও অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ মনোযোগ দেয়, যার ফলে এটি কোমল হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন: “তুরাহ শরিয়া কঠোরতা দ্বারা প্রভাবিত, এবং ইঞ্জিল শরিয়া কোমলতা দ্বারা প্রভাবিত, অপরদিকে আল-কুরআন শরিয়া উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করে এবং উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।” (ইবনে তাইমিয়াহ, তারিখবিহীন: ২৪০)

সুতরাং, নুরচোলিশ মাজিদ (১৯৯৪: ৭)-এর মতে, পূর্ববর্তী দুটি ধর্মের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ইসলামে বাহ্যিকভাবে ইহুদি ধর্মের মতো মানব আচরণের সমস্যা-কেন্দ্রিক আইনগত শিক্ষা রয়েছে, কিন্তু খ্রিস্টধর্মের মতো গভীর আধ্যাত্মিক শিক্ষাও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পার্থক্যযোগ্য হলেও, এই দুটি অবিচ্ছেদ্য।ধর্মীয় উপলব্ধিতে ভারসাম্যের এই নীতিটি যদি আমরা অনুসন্ধান করি, তবে এর মূল প্রোথিত রয়েছে নবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের জীবন-ঐতিহ্যের মধ্যে, যা প্রতিফলিত করে নবী (সাঃ)-এর সেই আধ্যাত্মিক জীবনকে যা তাঁর উম্মতকে অবশ্যই অনুকরণ করতে হবে। নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, নবী (সাঃ)-এর ধর্মীয় উপলব্ধির ধরনটি প্রতিফলিত করে মধ্যপন্থী ধর্মীয় আচরণ। একটি মধ্যপন্থী মনোভাব মানে এমন একটি জীবনদর্শন যা স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণ করে, ভৌত নিয়ম থেকে খুব বেশি দূরে নয় এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় (হোসেন নাসর, ২০০৩, ২৫৯)।

অন্য কথায়, নবী (সাঃ) একটি সমন্বিত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় উপলব্ধির চর্চা করেছিলেন।

এটি তাঁর বন্ধুদের জন্য তাদের ধর্মীয় জীবন অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাঁর কিছু সুপারিশ থেকে আহরণ করা যেতে পারে; যথা:

ক. ভারসাম্যপূর্ণভাবে ধর্মকে উপলব্ধি করার নির্দেশ

নামধারী একজন সাহাবী সম্পর্কে একাধিক হাদীস থেকে এটি দেখা যায়

উসমান ইবনে মাযউন,

যেখানে মুহাম্মদ তাকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে ধর্মের প্রশংসা করতে বলেছিলেন,

অনুসরণ হিসাবে:

دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبى صلعم.فرأينها سيئة الهنيئة, فقلنا لها: ما لك؟ فما فى

قريش أغنى من بالك! قالت: ما لنا منه شئ. اما ليله فقائم، وأما نهاره فصائم. فدخلنا إلى النبى

,فذكره ذلك له فلقيه

فقال: ইয়া عثمان! أما لك بى أسوة? فقال: بابى وأمى وما ذلك! قال: تصوم النهار وتقوم الليل? قال: إنى

: ألفعل, قال

ال تفعل! إن لعينك عليك حقا, وإن ألهلك عليك حقا. فصل ونم وصم وافطر .

“উসমান ইবনে মাযহুনের স্ত্রী নবীর স্ত্রীদের বাড়িতে গেলেন, এবং তাঁরা তাঁকে দেখলেন একতার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাই তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন: “তোমাদের কী হয়েছে? কুরাইশদের মধ্যে তোমাদের স্বামীর চেয়ে ধনী আর কেউ নেই!”। সে উত্তর দিল: “আমরা তার কাছ থেকে কিছুই পাইনি। কারণ সে রাতে ইবাদত করে এবং দিনে রোজা রাখে।” তারা নবীর কাছে গিয়ে তাঁকে এই বিষয়ে জানাল। তখন নবী তার (উসমান ইবনে মাযহুন) সাথে দেখা করলেন এবং বললেন: “হে উসমান, তোমার জন্য কি আমার কাছে কোনো উদাহরণ নেই?”
সে উত্তর দিল: “আমার বাবা-মায়ের কসম, আপনিও সেরকমই।”
তারপর নবী বললেন: “এটা কি সত্যি যে তুমি প্রতিদিন রোজা রাখো এবং রাতে ঘুমাও না (ইবাদত করো না)?”
সে উত্তর দিল: “আমি করতাম।” নবী বললেন: “এমনটা করো না। আসলে তোমার চোখের তোমার উপর অধিকার আছে, এবং তোমার পরিবারের তোমার উপর অধিকার আছে। সুতরাং নামাজ পড়ো ও ঘুমাও, রোজা রাখো ও খাও।” মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে, হাদিসটিতে বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) মাযউনকে ইসলামী শিক্ষার উপলব্ধি বা অনুধাবন ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন।

খ. সঠিকভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যে ধর্ম পালনের নির্দেশ

এই নির্দেশটি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সেই উপদেশেও লিপিবদ্ধ আছে, যেখানে তিনি উসমান ইবনে মাযউনকে ধর্মীয় শিক্ষা সরলভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যে পালন করার কথা বলেছিলেন।

উসমান ইবনে মাযউন একটি বাড়ি কিনলেন, তারপর তিনি সেখানে (সবসময়) ইবাদত করার জন্য বাস করতেন। এই খবর নবী (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছালে, তিনি তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁকে তাঁর বাসগৃহের বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন: "হে উসমান, আল্লাহ আমাকে সন্ন্যাসী জীবনের শিক্ষা দিয়ে পাঠাননি, বরং আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম দ্বীন হলো আল-হানাফিয়্যাত আস-সামহাহ (ইসলামের ব্যাপক চেতনা)।" সত্য)।" (সুনান আল-দারামি, এন.ডি.: 179; নুরকোলিশ মাজিদ 1995 97;

সুলায়মান: 2015: 305) নবী (সাঃ)-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছাল যে, তাঁর একদল বন্ধু নারী ও মাংস পরিহার করতেন। তাঁরা একত্রিত হলেন এবং নারী ও মাংস পরিহার করার এই মনোভাব নিয়ে আলোচনা করলেন। তখন নবী (সাঃ) কঠোরভাবে সতর্ক করে বললেন: "নিশ্চয়ই আমাকে সন্ন্যাসী জীবনের শিক্ষা নিয়ে পাঠানো হয়নি। বরং সর্বোত্তম দ্বীন হলো আল-হানাফিয়্যাত আস-সামহাহ।"

পার্থিব সুখ-সুখ পরিহার না করে ধর্মীয় শিক্ষা পালন করা

এ প্রসঙ্গে, আল-থাব্বারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে (জুয ৭: ৯) তাঁর এক বন্ধুর স্ত্রীর অভিযোগ বর্ণনা করেছেন, যিনি তাঁর স্বামীর দ্বারা অবহেলিত হয়েছিলেন, নিম্নরূপ: বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আল-আশ-এর সাথে দেখা করতে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে দয়া প্রার্থনা করলেন, তখন তিনি বললেন: "কেমন আছেন, হে আব্দুল্লাহর মা?" তিনি উত্তর দিলেন: "সে একা ছিল, তাই সে ঘুমায়নি, রোজা ভাঙেনি, মাংস খেতে চায়নি এবং পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করেনি।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "সে এখন কোথায়?" উত্তর দিলেন: "সে বাইরে আছে এবং এই সময়ে প্রায় বাড়িতে চলে এসেছে।" তিনি বললেন: "যখন সে বাড়ি আসবে, তখন তাকে আমার জন্য ধরে রেখো।" সুতরাং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বাইরে গেলেন, তারপর 'আব্দুল্লাহ এলেন, এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রায় বাড়িতেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন:

"হে 'আব্দুল্লাহ ইবনে

'আমার, আপনার সম্পর্কে আমার কাছে যে খবর এসেছে, সে ব্যাপারে কী বলবেন? যে আপনি

ঘুমান না।" তিনি উত্তর দিলেন:

"এর মাধ্যমে আমি আরও বড় বিপদ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে চাই।" তিনি বললেন: "আর আমার কাছে খবর এসেছে যে আপনি আপনার রোজা ভাঙেননি।" তিনি উত্তর দিলেন: "এর মাধ্যমে আমি জান্নাতে আরও উত্তম কিছু চাই।" তিনি বললেন: 'আর আমার কাছে খবর এসেছে যে আপনি তোমার পরিবারের প্রতি তাদের অধিকার পূরণ করেনি।" সে উত্তর দিল: "তাতে আমি তাদের চেয়ে উত্তম একজন নারী চাই।" তখন আল্লাহর রাসূল বললেন: "হে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, তোমার জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে একটি উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর আল্লাহর

রাসূল রোজা রাখতেন ও রোজা ভাঙতেন, মাংস খেতেন এবং তাদের পরিবারের অধিকার পূরণ করতেন। হে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, নিশ্চয়ই তোমার উপর আল্লাহর অধিকার রয়েছে, নিশ্চয়ই তোমার উপর তোমার শরীরের অধিকার রয়েছে এবং নিশ্চয়ই তোমার পরিবারের অধিকার রয়েছে।"
এ প্রসঙ্গে নুরচোলিশ মাজিদ (১৯৯৫: ৯৬-৯৭) মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর নীতির মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল আমাদের জন্য একটি সুস্থ ও সঠিক জীবনধারার বর্ণনা দিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন যে, বাড়াবাড়ি রকমের মনোভাব নিন্দনীয়, এমনকি একজন বান্দার আধ্যাত্মিক জীবনের মনোভাবের ক্ষেত্রেও। কারণ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করেন না, যদি তাঁর সুন্নাহকে উপেক্ষা করা হয় এবং তারপর সেই ব্যক্তি মনে করে যে এই মনোভাব তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এনে দেয়।

ঘ) অন্যদের মনস্তত্ত্ব ও প্রেরণার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাদের সংশোধন করা
নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বাস্তব মনস্তত্ত্বের মাধ্যমে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতেন এবং এমনভাবে অনুপ্রাণিত করতেন যা তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসত।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে:
আমি আবু তালহার বাড়িতে লোকদের পরিচারক ছিলাম এবং সেই দিনগুলোতে... খেজুর থেকে পানীয় তৈরি করা হতো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাউকে আদেশ দিলেন ঘোষণা করতে যে, মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আবু তালহা আমাকে আদেশ দিলেন বাইরে গিয়ে মদ ফেলে দিতে। আমি বাইরে গিয়ে তা ফেলে দিলাম এবং তা মদিনার রাস্তায় বয়ে গেল। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করলেন এবং লোকদের বললেন যে মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যখন এই ঘোষণা লোকদের কাছে পৌঁছাল, তারা যেখানে ছিল সেখানেই থেমে গেল এবং মদ ফেলে দিল আর সেদিকে ফিরেও তাকাল না। [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আশরাবা, হাদিস: ১৯৮০] ঙ) হাসি ও ক্ষমাকে সদ্গুণ হিসেবে বর্ণনা:
হাসি আল্লাহর একটি দান, যার রয়েছে আকর্ষণ ও অনুপ্রেরণার অসীম শক্তি; যা নিমেষে দুঃখ ও বিষাদ দূর করে এবং ঘোর শত্রুদেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত করে।

অতএব, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে জায রা.

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর চেয়ে বেশি হাসতেন এমন কাউকে আমি দেখিনি।
(صلى الله عليه وسلم).
[সুনান আল-তিরমিযী, কিতাব আল-মানাকিব, অধ্যায় ফি আশাশাত-আন-নবী, (
صلى الله عليه وسلم (হাদীস 3641:)]
আসলে নবী মুহাম্মদের চেয়ে মানব মনস্তত্ত্ব আর কেউ জানত না
(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তিনিই) হাসিমুখে সবার সাথে দেখা করলেন মুখ
28
এমনকি একজন শত্রু বা পাপকারী ব্যক্তিও দরবারে হাজির হতো
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আতঙ্কের সাথে কিভাবে রাগান্বিত চেহারার মুখোমুখি হবেন
রাগ ও ক্রোধের পরিবর্তে নবী করীম (সা.) কে হাসতে দেখলেন
নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখোমুখি হোন (প্রেম ও স্নেহের সাথে তারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং
আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইচ্ছার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা।
বদর যুদ্ধের পর দুই কিছু লোক নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয় এবং ধরা পড়ে। তাদের উপর রাগ করে তাদের হত্যা করার পরিবর্তে, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাসিমুখে তাদের ক্ষমা করে দেন। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতকে হাসিমুখে সাক্ষাতের নির্দেশ দেন এবং বলেন: তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলা একটি সদকা। [সুনান আল-তিরমিযী, হাদীস: ১৯৫৬]
ঙ) মানুষের তৈরি সম্মান ও মর্যাদার মানদণ্ড অপসারণের মাধ্যমে হীনমন্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের জটিলতা:
দৈনন্দিন জীবনে এটি একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা যখন মানুষ নিজেকে অন্যদের সাথে তুলনা করে যে, আমি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে বেশি দক্ষ, যোগ্য এবং উন্নত। সুতরাং এই অভিজ্ঞতাটি শ্রেষ্ঠত্বের জটিলতার জন্ম দেয়।
বেশিরভাগ মানুষ নিজেদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট এবং নিজেদেরকে গড়পড়তা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। যখন আমরা নিজেদেরকে এমন মানুষদের সাথে তুলনা

করি যারা আমাদের নিজেদের পেশার মধ্যে অত্যন্ত যোগ্য, সভ্য এবং আরও উন্নত, তখন আমরা তুলনামূলকভাবে নিজেদেরকে অপর্যাপ্ত মনে করতে পারি। যাইহোক, যখন অপর্যাপ্ততার এই অনুভূতিগুলো অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে এবং আমাদের জীবনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, তখন এটি হীনমন্যতার জটিলতার মূল কারণ হতে পারে।

দৈনন্দিন জীবনে অপর্যাপ্ততা বা নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি এই বিশ্বাসের কারণে হয় যে আপনি অন্যদের চেয়ে শারীরিকভাবে বা মানসিকভাবে নিকৃষ্ট। এই দুটি প্রতিক্রিয়াই মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিকাশকে খারাপভাবে প্রভাবিত করে। যেহেতু এই মহাবিশ্বে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে মানব ব্যক্তিত্ব, চরিত্র গঠন এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্পর্কে আর কেউ ভালো জানেন না, তাই নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুজ্জতুল বিদায়ের শেষ খুতবায় এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। হযরত উকবাহ ইবনে আমির বর্ণনা করেছেন যে, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “নিশ্চয়ই তোমাদের এই বংশধারা কারো উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয়। তোমরা সবাই তো আদমের সন্তান মাত্র। ধর্ম ও সৎকর্ম ছাড়া কেউ কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। মানুষের জন্য অশ্লীল ও কুৎসা প্রচারক হওয়াই যথেষ্ট পাপ।” পরচর্চাকারী, কৃপণ, অথবা কাপুরুষ। উপরোক্ত হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে, জাতি, ধর্ম ও বর্ণের কারণে কারোই এই হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয় যে সে অন্যের চেয়ে নিকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ। সর্বশক্তিমান আল্লাহর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। [মুসনাদ আহমাদ: হাদিস: ১৭৩১৩]

তিনি ((صلى الله عليه وسلم)বলেছেন, "দুনিয়ার কামনা-বাসনা অন্যের উপর হীনমন্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।"

কারণ এটি ক্রোধ, দুঃখ, হতাশা এবং স্বার্থপরতার মতো নেতিবাচক পরিণতির জন্ম দেয়, যা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে এবং মানুষ মানসিক অসুস্থতা, বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, লোভ, বিদ্বেষ, প্রতারণা এবং নেতিবাচক চিন্তাভাবনায় ভোগে, যা মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

চ) ক্রোধের ব্যাধি থেকে নফসের পরিশুদ্ধি :

ক্রোধ একটি মানবিক অনুভূতি ও আবেগ যা মানুষের স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্বকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। যখন কোনো কিছু ভুল হয়, তখন এটি একটি তীব্র

অনুভূতি ও আবেগ। এর বৈশিষ্ট্য হলো হতাশা, বিরক্তি, মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ। ক্রোধ একটি মানসিক অবস্থা যার তীব্রতা মৃদু বিরক্তি থেকে শুরু করে তীব্র আক্রোশ ও রোষ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। এটি মানবদেহে শারীরবৃত্তীয় এবং জৈবিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে, যার ফলে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, পেশীতে টান এবং রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। নফসের পরিশুদ্ধিকারী হিসেবে, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রায় ১৪৪৫ বছর আগে ক্রোধ নামক মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছিলেন।

হযরত আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রাগান্বিত হয়, তবে সে বসে পড়ুক। যদি আরও বেশি রাগান্বিত হও, তবে শুয়ে পড়ো।"

উক্ত হাদিসে বলা হয়েছে, বসা বা শুয়ে থাকা এমন একটি অবস্থা যা হৃদস্পন্দন এবং রক্তচাপ কমিয়ে দেয়, যা আজকের আধুনিক মনোবিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকরা সমর্থন করেন।

ছ) স্নেহপূর্ণ ও নম্র কথায় মানুষকে সম্বোধন করা ও সংশোধন করা এবং কখনও কখনও উপেক্ষা করা: কাউকে ভালো ও স্নেহপূর্ণ কথায় ডাকা বা সম্বোধন করা এবং তাদের সাথে নম্রভাবে আচরণ করা একজন ব্যক্তিকে অনুগত ও দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। ভালোবাসা, স্নেহ ইতিবাচকতা সৃষ্টি করে এবং একটি অনুকূল পরিবেশ প্রদান করে। অন্যদিকে, কাউকে অভদ্র ভাষায় সম্বোধন করা ঘৃণা, শত্রুতা ও অবাধ্যতার জন্ম দেয় এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করে।

এ কারণেই মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ভালো নামে ডাকতেন এবং প্রত্যেককে ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে সম্বোধন করতেন। একইভাবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিশুদের "ইয়া বনি" অর্থাৎ "হে আমার পুত্র" বলে ডাকতেন। ইসলাম অনুসারে সকল মুসলমান ভাই ভাই, একারণেই আরবরা শিশুদের "ইয়া ইবনে আখি" বলে ডাকত।

জ) মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর অনুযায়ী তাদের সাথে কথা বলা:

কথোপকথন মানব অভিজ্ঞতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একে অপরের সাথে আমাদের ধারণা, চিন্তা, অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি ভাগ করে নেওয়ার জন্যই আমরা মুখোমুখি কথা বলি ও কথোপকথন করি। বেশিরভাগ মানুষেরই

তাদের সামনে থাকা ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর বোঝার ক্ষমতা থাকে না, যার ফলে অস্পষ্টতা দেখা দেয় এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে চলে যায়। এইসব বিষয় মাথায় রেখে মুহাম্মদ ((صلى الله عليه وسلمমানুষের মানসিক স্তর অনুযায়ী তাদের সাথে কথা বলতেন। তবে, মানুষের সাথে যোগাযোগ ও ভাব বিনিময়ের পদ্ধতি ও রীতি সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে নবী মুহাম্মদ (-(صلى الله عليه وسلم এর জীবন অধ্যয়ন থেকে সবচেয়ে ভালোভাবে ধারণা করা যায়।
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আবু তামিমিয়্যাহ হাজিমীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একজন বেদুইন (মরুভূমিতে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি) নবী মুহাম্মদ (صلى الله -(عليه وسلمএর কাছে এসে বললেন: আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি ((صلى আল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন,
হ্যাঁ।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাকে দাওয়াত করো?
তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত করি। যখন তুমি বিপদে তাঁকে ডাকো, তিনি তোমার কষ্ট, দুঃখ-কষ্ট ও প্রতিকূলতা দূর করে দেবেন। আর যদি তুমি পথভ্রষ্ট হও বা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হও এবং তাঁকে ডাকো, তিনি তোমাকে পথ দেখাবেন।
এ কথা শুনে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করল।
[সহীহুল বুখারী, হাদিস:২২১]
ঝ) সহমানবদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো ও অসুস্থদের দেখতে যাওয়া:
নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার অসুস্থদের দেখতে যাওয়া ফরজ।”
মুসলিম ভাই
যখন সে অসুস্থ”।
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক অসুস্থ ব্যক্তির কাছে তাকে দেখতে গেলেন এবং বললেন, "চিন্তা করো না, ইনশাআল্লাহ, (তোমার এই অসুস্থতা) তোমার পাপের কাফফারা হয়ে যাবে।"
[আল সহীহুল বুখারী, হাদিস: ৫৬৬২]
ইসলামী ইতিহাস জুড়ে সুফিবাদের চর্চা

আজকের বিশ্বে সৃষ্ট সকল ফিতনা (বিবাদ ও সমস্যা)-র বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদেরকে ইলম আল নফস (আত্মার বিজ্ঞান) জানতে হবে, যাতে আমরা বিকৃত না হয়ে যাই। কারণ আত্মার এই বিজ্ঞানগুলোর মাধ্যমেই এই ফিতনাগুলো (বিবাদ ও সমস্যা) সৃষ্টি হচ্ছে। কর্পোরেশনগুলো মানুষের আত্মাকে নিয়ে গবেষণা করেছে এবং তার বিরুদ্ধেই একে ব্যবহার করেছে, যাতে তারা তার দুর্বলতা থেকে লাভবান হতে পারে।

ইতিহাস জুড়ে আলেমগণ এটি বুঝেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, সালাহ আল দীন আইয়ুবী, যিনি ক্রুসেডারদের কাছ থেকে জেরুজালেম জয় করার পর তার পুরনো জীবন থেকে তওবা করেন এবং তাসাউফ চর্চা শুরু করেন, কেবল তখনই তিনি সেই শহরের জন্য লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

ইমাম আল-হাসান আল-বাসরি (মৃত্যু: ১১০ হিজরি) ছিলেন আল্লাহর একজন ওলী (বন্ধু) এবং তাসাওউফ চর্চাকারী ও এই শাস্ত্রের বিকাশকারী প্রাথমিক ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। তিনি (রাঃ) ছিলেন উম্মে সালামার (নবীর স্ত্রী) এক মুক্তদাসী এবং যায়েদ ইবনে সাবিতের (নবীর সৎপুত্র) এক মুক্তদাসের পুত্র। বসরা (ইরাক)-এর এই মহান ইমাম, নবীর সুন্নাহর কঠোর ও ব্যাপক রূপায়ণের জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর অগাধ জ্ঞান, কঠোর সংযম এবং বৈরাগ্যের জন্যও বিখ্যাত ছিলেন। ইবনে আল-জাওজি তাঁর জীবন ও আচরণের উপর ‘আদাব আল-শাইখ আল-হাসান ইবনে আবি আল-হাসান আল-বাসরি’ শিরোনামে ১০০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

হাদিস বিশারদ আবু নু'আইম আল-ইসফানাহী (মৃত্যু ৪৩০ হিজরি) তাঁর সাহাবী, তাবেঈন, সাধু ও সুফিদের জীবনীগ্রন্থ 'হিলিয়াত আল-আওলিয়া' (সাধুদের অলঙ্করণ)-এ উল্লেখ করেন যে, আল-হাসানের ছাত্র আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে যায়েদ (মৃত্যু ১৭৭ হিজরি) সর্বপ্রথম বর্তমান ইরান-ইরাক সীমান্তবর্তী আবাদানে একটি সুফি খানিকা বা অতিথিশালা এবং মাযহাব নির্মাণ করেন (আবু নু'আইম, হিলিয়াত আল-আওলিয়া ৬:১৫৫)।

আবু হাশিম আল-যাহিদ (সুফি) বলেছেন: "আল্লাহ দুনিয়ার উপর পরকীয়তার ছাপ রেখেছেন, যাতে মুরিদদের (অনুসন্ধানকারীদের) বন্ধুত্বপূর্ণ সঙ্গ কেবল তাঁর সান্নিধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, দুনিয়ার সাথে নয়, এবং যাতে যারা তাঁর আনুগত্য করে, তারা দুনিয়াকে পরিহার করার মাধ্যমে তাঁর কাছে পৌঁছায়। আল্লাহর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা (আহলুল মারিফা বিল্লাহ) দুনিয়ায় পরবাসী এবং পরকালের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে।" (আবু নু'আইম, হিলিয়াত আল-আওলিয়া)
মালিকি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মালিক বলেছেন:

"যে ব্যক্তি পবিত্র আইন (ফিকহ) না শিখে তাসাওউফ চর্চা করে, সে তার ঈমানকে কলুষিত করে, আর যে ব্যক্তি তাসাওউফ চর্চা না করে পবিত্র আইন (ফিকহ) শেখে, সে নিজেকেই কলুষিত করে। একমাত্র সেই ব্যক্তিই সত্য প্রমাণ করে, যে এই দুটিকে একত্রিত করে।" ('আলী আল-আদাউয়ী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৫।)
এর কারণ হলো, আল্লাহর বিধান না জেনে তাসাউউফের মাধ্যমে নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করলে, তা নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মনকে বিকৃত করে ফেলবে। অন্যদিকে, তাসাউউফ না জেনে বিধান চর্চা করলে তা হৃদয়কে এতটাই কঠিন ও অনমনীয় করে তুলবে যে, তা তার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বাইরের কোনো কিছু গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়বে।
আমাদের চারপাশে এবং আমাদের সাথে যা ঘটছে তা গ্রহণ ও বুঝতে পারাই হলো ইসলামের মূল লক্ষ্য। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ জান্নাতবাসীদেরকে সেখানে প্রবেশের ঠিক আগে বলবেন, যে মুহূর্তে তারা প্রথমবারের মতো আল্লাহর পরিপূর্ণ জীবন অনুভব করতে চলেছে, "হে শান্ত আত্মা, তোমার রবের কাছে ফিরে এসো, তুমি গৃহীত ও গ্রহণকারী" (৮৯:২৮)। যেহেতু আল্লাহ সর্বদা সৃষ্টির কাছে নিজেকে আরও বেশি করে প্রকাশ করেন, তাই একটি মৃত হৃদয় সেই স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, কারণ তারা এর জন্য উপযুক্ত নয়।
ইমাম তাজউদ্দিন আস-সুবকী (৭২৭ – ৭৭১ হিজরি), একজন প্রখ্যাত মুজতাহিদ ইমাম, বলেছেন –
"আল্লাহ তাদের [সুফিদের] প্রশংসা করুন এবং তাদের সালাম দিন এবং আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতে তাদের সাথে রাখুন। তাদের সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে এবং অনেক অজ্ঞ লোক এমন কথা বলেছে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়। আর

সত্য হলো, ঐ লোকেরা দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং ইবাদতে মগ্ন ছিল। ...তারা আল্লাহর বান্দা, যাদের দোয়া ও প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেন এবং যাদের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে জীবনধারণের ব্যবস্থা করেন।"
[মু'ঈদ আন-না'আম, তাসাওউফ নামক অধ্যায়] যারা ইজতিহাদ (আইনি যুক্তি) চর্চা করেন, তাদের জন্য কেবল সঠিক বোঝাই যথেষ্ট নয়, বরং আরবি ভাষায় পূর্ণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য থাকা আবশ্যক। তাঁর গ্রন্থ 'আল-মুওয়াফাকাত ফি উসুল আল-শারিয়া' (ঐশী আইনের উৎসসমূহের সামঞ্জস্য) -এ তিনি মত প্রকাশ করেন যে, কুরআন ও সুন্নাহর ভাষাই এই ধরনের আলেমদের বোঝার চাবিকাঠি, এবং এই বিষয়ে ঘাটতিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির ইজতিহাদ (আইনি রায়) অগ্রহণযোগ্য।

যেহেতু মুজতাহিদের মতামত সাধারণ মানুষের জন্য একটি হুজ্জা বা প্রমাণ, তাই এই স্তরের কর্তৃত্বের জন্য উৎসসমূহে সরাসরি প্রবেশাধিকার এবং আরবি ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা থাকা অপরিহার্য। (আল-শাতিবি, আল-মুওয়াফাকা ফি উসুল আল-শারিয়াহ

(কায়রো: আল-মাকতাবা আল-তিজারিয়্যা আল-কুবরা, ১৯৭৫) ৪:৬০)
তিনি তাঁর 'আল-ইতিসাম' গ্রন্থে লিখেছেন: অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে যে, সুফিরা শরীয়ত পালনে শিথিল। তাদের উপর এমন বিশ্বাস আরোপ করা তো দূরের কথা! তাদের পথের সর্বপ্রথম ভিত্তি হলো সুন্নাহ এবং এর পরিপন্থী বিষয় পরিহার করা!

জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু ৯১১) ছিলেন অষ্টম ইসলামী শতাব্দীর শায়খুল ইসলাম আল-সুয়ূতী, সংস্কারক (মুজাদ্দিদ) এবং একজন মুজতাহিদ ইমাম। তিনি তাঁর তাসাউফ বিষয়ক গ্রন্থ 'তা'য়িদ আল-হাকিকা আল-আলিয়্যা ওয়া-তাশয়িদ আল-তারিকা আল-শাযিলিয়্যা' (মহান সত্যের প্রতিপত্তি এবং শাযিলী পথের সুদৃঢ়করণ)-এ বলেছেন: তাসাউফ নিজেই একটি অত্যন্ত সম্মানিত জ্ঞান। এটি ব্যাখ্যা করে কীভাবে নবীর সুন্নাহ অনুসরণ করতে হয় এবং বিদআত ত্যাগ করতে হয়, কীভাবে অহংকে পরিশুদ্ধ করতে হয়... এবং সত্যিকার অর্থে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়... আমি সেই বিষয়গুলো দেখেছি যা শরীয়তের ইমামগণ সুফিদের মধ্যে সমালোচনা করেছেন, এবং আমি একজনও সত্যিকারের সুফিকে এমন অবস্থানে থাকতে দেখিনি। বরং, এগুলো ধারণ করে আছে উদ্ভাবকের অনুসারীরা এবং সেইসব

চরমপন্থীরা, যারা নিজেদের জন্য সুফি উপাধি দাবি করেছে, যদিও বাস্তবে তারা তা নয়... হৃদয়ের বিজ্ঞানের অন্বেষণ, এর রোগ যেমন ঈর্ষা, ঔদ্ধত্য এবং গর্বের জ্ঞান। ইমাম আল গাজালীর ভাষ্যের উপর ইমাম কারী রচিত গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি, যা সম্ভবত সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, এবং আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন!" (৩:৩১) এই আয়াতের উপর ইমাম গাজালী ও ইমাম কারী উভয়ের ব্যাখ্যায় উৎসর্গীকৃত এবং এটি একই বিষয়ে আল-হারাবীর 'কিতাব সাদ ময়দান' গ্রন্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে ইমাম কারী আল-হাসান আল-বাসরীর এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: "যে ব্যক্তি (সত্যিই) তার রবকে জানে, সে তাঁকে ভালোবাসে, এবং যে ব্যক্তি (সত্যিই) দুনিয়াকে জানে, সে তা ছাড়াই চলে।"

অধ্যায় ২ : সুফিবাদের বিকাশ ও বিবর্তন

ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কালে (মধ্যযুগীয় ও মধ্যযুগ-পরবর্তী বিকাশ)
সুফিবাদের পদ্ধতিগত বিন্যাস
সুফিবাদ স্বয়ং নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময় থেকেই বিদ্যমান,
এবং এক অর্থে তিনিই আদর্শ সুফি—এমন একজন ব্যক্তি যাঁকে সকল সুফি অনুকরণ করতে চান। *আসহাব আল-সুফফাহ* সম্পর্কিত তত্ত্ব থেকেও এই সংযোগটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিকভাবে, এই ধরনের দাবি যাচাই করা কঠিন, কিন্তু আমরা যে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি তা হলো, একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন হিসেবে সুফিদের আবির্ভাব ঐতিহাসিক নথিতে খুব তাড়াতাড়ি—প্রায় ৮ম শতাব্দী থেকে। এর পরেই লোকেদের সুফি হিসাবে উল্লেখ করা শুরু হয়।

কিন্তু যেমনটা আমরা বলেছি, সুফিরা নিজেরাই যুক্তি দেবেন যে, যদিও নামটি ছিল না, এই ঘটনাটি সরাসরি নবীর কাছ থেকে এবং
এমনকি তাঁরও আগে থেকে এসেছে—এই মনোভাবটি সুফি ব্যক্তিত্ব

আলী আল-হুজউইরির মধ্যে খুব ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যিনি একাদশ শতাব্দীতে লিখেছেন যে:

"আজ তাসাউফ হলো বাস্তবতাহীন একটি নাম, অথচ আগে এটি ছিল নামহীন এক বাস্তবতা।"

এই প্রথমদিকের সুফিদের মধ্যে বিশর আল-হাফি (বিশর আল-হাফি), নারী রাবিয়া আল-বাসরি, আবু সুলায়মান আল-দারানি প্রমুখ ব্যক্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত।

ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক চর্চা থেকে সংগঠিত সম্প্রদায়ে রূপান্তরটি খ্রিস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ধীরে ধীরে ঘটেছিল। এই গঠনমূলক সময়ে, আধ্যাত্মিক গুরুরা তাদের চারপাশে শিষ্য জড়ো করতে শুরু করেন, এবং আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক সচেতনতার নির্দিষ্ট পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন।

এইসব শিথিল সমাবেশে শুরুতে কোনো আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক কাঠামো ছিল না, বরং তা নির্দিষ্ট গুরুদের আকর্ষণীয় কর্তৃত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বলা যায় যে, সেই সময়ে অনেকগুলো সমান্তরাল রহস্যবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটছিল, যেগুলোর সবগুলোকে আরও বিশদ বিশ্লেষণ ছাড়া সুফিবাদ বলা যায় না।

তাসাওউফ/সুফিবাদের পদ্ধতিগতকরণের প্রথম পর্যায় এবং ইসলামের মূলধারার অংশ হিসেবে এর প্রবেশের সূচনা ঘটে দশম ও একাদশ শতকের প্রথম সুফি নির্দেশিকাগুলোর মাধ্যমে—এগুলো হলো সুফিবাদের এমন সব লিখিত গ্রন্থ যা এর পরিভাষা, ধারণা ও অনুশীলনের মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরে এবং এর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠাতাদের জীবনীও ধারণ করে।

এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে -

আল-কুশাইরি (মৃত্যু ১০৭২) রচিত 'রিসালাত আল কুশাইরিয়্যা' - "সুফিবাদ বিষয়ক পত্র",

আল-সাররাজ (মৃত্যু ৯৮৮) রচিত 'কিতাব আল লুমা' - "সুফিবাদ বিষয়ক আলোকচিত্রের গ্রন্থ",

আল-হুজউইরি (মৃত্যু ১০৭৭) রচিত 'কাশফ আল মাহজুব' - "গোপনের উন্মোচন" এবং

আবু তালিব আল-মাক্কি (মৃত্যু ৯৯৬) রচিত 'কুত আল কুলুব' - "হৃদয়ের পুষ্টি"।

ইতিহাস জুড়ে এই গ্রন্থগুলো সুফি শিক্ষা ও ধারণার মূল উৎস হিসেবে কাজ করেছে এবং আমরা এখনও কিছু প্রাথমিক সুফি ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের জন্য অন্যান্য জীবনীমূলক বিবরণের পাশাপাশি এগুলোর উপর নির্ভর করি। এগুলো ইসলামী বিশ্বে সুফিবাদের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এটা সত্য যে, কিছু মুসলমানের কাছে সুফিগণ ও তাদের কার্যকলাপ সন্দেহজনক বলে বিবেচিত হতো, এবং এই সুফি নির্দেশিকাগুলো আংশিকভাবে এটা প্রমাণ বা স্পষ্ট করার একটি উপায় হিসেবে কাজ করেছিল যে, সুফিদের কার্যকলাপ ও ধারণাগুলো ইসলাম ধর্ম এবং এর আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

আর আমরা ঠিক এটাই দেখতে পাই — সুফিবাদের একটি ক্রমান্বয়িক প্রসার এবং মূলধারার ইসলামী কার্যকলাপ ও ধর্মতত্ত্বে এর নীতিগুলোর ব্যাপকতর গ্রহণযোগ্যতা, বিশেষ করে একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে, যে সময়ে এটি মূলত মূলধারায় পরিণত হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের মূলধারা বা সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিব্যক্তি হিসেবেই থেকে যায়।
তরিকাগুলোর মাধ্যমে সুফিবাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ছিল নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং আধ্যাত্মিক চাহিদার একটি প্রতিক্রিয়া। ইসলামী সভ্যতা ভৌগোলিকভাবে প্রসারিত হওয়ার এবং সামাজিকভাবে আরও জটিল হয়ে ওঠার সাথে সাথে, সুফি তরিকাগুলো আধ্যাত্মিক শিক্ষা, সামাজিক সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক একীকরণের জন্য কাঠামো প্রদান করেছিল। এই সময়ে সুফি সাধনার সাথে সম্পর্কিত ভৌত অবকাঠামো—যেমন জাওয়িয়া (আশ্রম), রিবাত (বিশ্রাম), খানকাহ (আশ্রমশালা) এবং তেক্কে (মিলন গৃহ)—প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা নিবিড় আধ্যাত্মিক সাধনা এবং সামাজিক সম্পৃক্ততা উভয়ের জন্য স্থান তৈরি করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভূমিকা পালন করত। শাসকেরা সুফি প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থায়নের মাধ্যমে তাদের ধার্মিকতা প্রদর্শন করতেন এবং জনসমর্থন অর্জন করতেন। নূর আদ-দিন জাঙ্গি ছিলেন সিরিয়ায় সুফি কাঠামোর প্রথম প্রধান পৃষ্ঠপোষক, যিনি তার সাম্রাজ্য জুড়ে সুফি গোষ্ঠীগুলোকে খানকাহ নির্মাণ করে উপহার দিয়েছিলেন। দামেস্কে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো উমাইয়া মসজিদের কাছে কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থিত ছিল এবং প্রায়শই একই পৃষ্ঠপোষকের প্রতি উৎসর্গীকৃত মাদ্রাসার সাথে যুক্ত থাকত।

মিশরে, সালাদিন ১১৭৩ সালে কায়রোতে প্রথম খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন, যা ফাতিমিদের বিরুদ্ধে তাঁর বিজয় এবং আইয়ুবীয় সুন্নিবাদের সূচনাকে চিহ্নিত করে। তিনি ফাতিমিদের একটি প্রাসাদ, সাঈদ আল-সু'আদাকে, আল-খানাকাহ আল-সালাহিয়্যা৫ নামক একটি সুফি খানকাহে রূপান্তরিত করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি আগত সুফিদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করত এবং প্রধান সুফির পদ তৈরি করেছিল, যিনি দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করতেন এবং আবাসিক সুফিদের পরামর্শ দিতেন। এই পদটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল, যা সুলতানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখত এবং স্থানীয় মাদ্রাসাগুলোতে সামরিক ক্ষমতা ও শিক্ষাগত কর্তৃত্ব অর্জন করত।

উদাহরণস্বরূপ, ইতিহাসের প্রাচীনতম সুফি তরিকাগুলোর মধ্যে একটি হলো তথাকথিত কাদরিয়া তরিকা, যা আজও বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বিস্তৃত তরিকা। এই তরিকাটি দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বাগদাদি সুফি, আব্দুল কাদির আল-জিলানিকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছিল এবং তাঁর নামানুসারেই এর নামকরণ করা হয়েছে।

মধ্যযুগ-পরবর্তী বিকাশ

সুতরাং, এগুলো হলো সুফিবাদের কিছু মৌলিক বিষয় যা মধ্যযুগে আরও সুসংগঠিত রূপ লাভ করেছিল, কিন্তু আমাদের এই ফাঁদে পড়া উচিত নয় যে আমরা সুফিবাদ নিয়ে এমনভাবে কথা বলব বা ভাবব যেন মধ্যযুগের পর এর আর কোনো বিকাশ ঘটেনি।

অনেক মানুষ, এমনকি পণ্ডিতরাও, প্রায়শই এই ভুলটি করেন যে তারা শুধু মধ্যযুগ নিয়ে কথা বলেন, পরবর্তী শতাব্দীগুলো বা বর্তমান সময় নিয়ে নয়, এবং কীভাবে বিষয়গুলোর বিকাশ ঘটেছে তা নিয়ে ভাবেন না।

ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন তরিকার বিস্তার নাটকীয়ভাবে ত্বরান্বিত হয়েছিল এবং সমগ্র ইসলামী বিশ্বে স্বতন্ত্র আঞ্চলিক রূপগুলো আবির্ভূত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, লক্ষ লক্ষ সদস্য নিয়ে শত শত তরিকা বিদ্যমান ছিল। এই সম্প্রসারণ আধ্যাত্মিক বংশধারার একটি জটিল বাস্তুতন্ত্র তৈরি করেছিল, যেখানে প্রায়শই প্রতিষ্ঠিত ধারাগুলো থেকে নতুন ধারাগুলো শাখা-প্রশাখা হিসেবে বিকশিত হতো—আধ্যাত্মিক বৈচিত্র্যায়নের এই প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত রয়েছে। এই

শতাব্দীগুলোতে সুফিবাদ বিকশিত ও পরিবর্তিত হতে থেকেছে, যদিও আমরা যে কিছু মূল বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলেছি, সেগুলো এখনও মূল নীতি ও দিক হিসেবে রয়ে গেছে।

কিন্তু আমি এখানে এই সময়কালের উপর এত বেশি মনোযোগ দিচ্ছি কারণ এটি অত্যন্ত গঠনমূলক। অনেক দিক থেকে, এই সময়েই বহু সুফি ধারণা প্রথমবারের মতো একটি বাস্তব রূপ লাভ করে এবং সুফিবাদও সুফি তরিকাগুলোর মাধ্যমে এমনভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় যা ইতিহাস জুড়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে থাকবে।

যেমনটা আমরা বলেছি, এই সময়কাল থেকে—মধ্যযুগ থেকে, বিশেষ করে একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে—সুফিবাদ মূলত ইসলামের মূলধারায় পরিণত হয়। উনিশ ও বিশ শতকের আধুনিক যুগ পর্যন্ত এটি ইসলামের মূলধারার, সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিব্যক্তির একটি অংশ ছিল, এবং কখনও কখনও, আজও বিশ্বের কিছু অংশে এটি এই ধরনের অবস্থান ধরে রেখেছে।

এর একটি ভালো উদাহরণ হলো পশ্চিম আফ্রিকা, সেনেগাল এবং গাম্বিয়ার মতো জায়গায়, যেখানে জনসংখ্যার ৯০ শতাংশেরও বেশি মুসলিম, এবং সেই মুসলিমদের আরও ৯০ শতাংশ সুফি ভ্রাতৃত্বের সাথে যুক্ত এবং এক অর্থে সুফি। এটি ঐতিহাসিকভাবে সুফিবাদ যেভাবে কাজ করেছিল তা প্রতিফলিত করে, কিন্তু আজকের ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য অনেক অংশে হয়তো তেমনটা নয়।

যদিও ইসলামী বিশ্বে তাসাওউফ আগের মতো ততটা প্রভাবশালী নয়, তবুও বিশ্বজুড়ে এর একটি উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। যেমনটা আমি বলেছি, সেনেগালের মতো জায়গায়, যেখানে জনসংখ্যার ৯০ শতাংশেরও বেশি মুসলিম, সেখানে সেই মুসলিমদের মধ্যে অতিরিক্ত আরও ৯০ শতাংশ একটি সুফি ভ্রাতৃত্বের সদস্য।

কিন্তু সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটি ঔপনিবেশিকতা এবং এর সাথে সম্পর্কিত ইসলামের অভ্যন্তরে আধুনিকতাবাদী সংস্কার আন্দোলনের উত্থানের একটি সংমিশ্রণ,

যা সুফিবাদকে কুসংস্কার হিসেবে দেখত। মূলত, উনিশ ও বিশ শতকের আধুনিকতাবাদী মুসলিমদের কাছে, সুফিবাদ ছিল পুরোনো, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি মতাদর্শ, যা ইসলামের যুক্তিবাদী, "সত্য" ধর্মকে কলুষিত করেছিল, এবং যা তারা পুনর্গঠন করতে চেয়েছিল।

এইসব উগ্রপন্থী আধুনিকতাবাদী ঐতিহ্যের কিছু অংশ, যেমন সালাফি ও ওয়াহাবিরা, একইভাবে সুফিবাদকে নিন্দনীয় উদ্ভাবন হিসেবে দেখে এবং অন্যান্য বিভিন্ন কারণে সুফিদের বিরুদ্ধে কবর পূজার মতো কাজের অভিযোগ তোলে। পশ্চিমা হস্তক্ষেপ এবং উপনিবেশবাদও এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছিল।
ইসলামের অভ্যন্তরে এই আধুনিকতাবাদী আন্দোলনগুলো বিংশ শতাব্দীর সময়কালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এর ফলে সার্বিক পরিস্থিতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। একইভাবে, প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত এবং ইউরোপীয়রা, যারা সুফি সাহিত্যের নাগাল পেয়েছিল, তাদের পক্ষে ইসলাম সম্পর্কে তাদের পূর্বকল্পিত ধারণাগুলোর সাথে সুফিবাদের সুন্দর ও পরিশীলিত ভাবনার সমন্বয় সাধন করা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

বিস্তারের ঐতিহাসিক ধারা
সুফি তরিকাগুলোর ভৌগোলিক বিস্তার আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংযোগের স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করেছিল, যা রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করার পাশাপাশি গভীর স্থানীয় শিকড়ও বজায় রেখেছিল। এই আদান-প্রদানের ধারাগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিকশিত হয়েছে, যা এমন জটিল নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে যা আজও সমসাময়িক ইসলামী আধ্যাত্মিকতাকে রূপদান করে চলেছে।
সুফি তরিকাগুলোর ভৌগোলিক বিস্তার স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ধারা অনুসরণ করেছিল; তরিকাগুলো প্রথমে ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রগুলোতে উদ্ভূত হওয়ার পর বাণিজ্য পথ, তীর্থযাত্রার পথ এবং রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক বরাবর প্রসারিত হয়েছিল। প্রধান তরিকাগুলো তাদের উৎপত্তিস্থলের সাথে সংযোগ বজায় রেখে আঞ্চলিক কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল, যা ইসলামী বিশ্বজুড়ে প্রভাবের পরস্পর ছেদকারী অঞ্চল তৈরি করেছিল। ঐতিহাসিক প্রমাণ ইঙ্গিত দেয় যে, "একাদশ শতাব্দী থেকে যাওয়িয়া ও খানকাহগুলো, যা পরিব্রাজক সুফিদের জন্য অস্থায়ী বিশ্রামস্থল হিসেবে কাজ করত, গ্রামাঞ্চলে নতুন ভক্তিমূলক জীবনধারা ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং মধ্য এশিয়া ও উত্তর

আফ্রিকার সীমান্তবর্তী ও অনারব অঞ্চলগুলোর ইসলামীকরণে একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিল”৬। এই প্রক্রিয়াটি আধ্যাত্মিক বংশধারার একটি জটিল ভূগোল তৈরি করেছিল যা অভিন্ন অনুশীলন এবং সম্পর্কের মাধ্যমে দূরবর্তী অঞ্চলগুলিকে সংযুক্ত করেছিল।

সুফি তরিকাগুলির আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাস্তবতা ভৌগোলিক সীমানা জুড়ে মানুষ, গ্রন্থ এবং ধারণার অবিরাম আদান-প্রদানের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই আদান-প্রদান একাধিক মাধ্যমে ঘটেছিল:

১. নতুন শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুদের ভ্রমণ

২. প্রখ্যাত শায়খদের কাছ থেকে নির্দেশনা লাভের জন্য শিষ্যদের যাত্রা

৩. প্রতিষ্ঠাতাদের সমাধিতে তীর্থযাত্রা

৪. নির্দেশনামূলক গ্রন্থ এবং আধ্যাত্মিক কবিতার বিনিময়

৫. অধিভুক্ত কেন্দ্রগুলির মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান

চলাচলের এই ধরণগুলি পণ্ডিতদের দ্বারা "মুসলিম আদান-প্রদান এবং নেটওয়ার্ক" হিসাবে অভিহিত একটি কাঠামো তৈরি করেছিল যা অভিন্ন আধ্যাত্মিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্রিত করেছিল। একটি গবেষণায় যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "সুফিবাদ পশ্চিম এশিয়া জুড়ে অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ধর্মান্তরকরণ এবং মধ্যস্থতার সেবায় কাজ করেছিল"। এই নেটওয়ার্কগুলি কেবল আধ্যাত্মিক বিনিময়ই নয়, বিশাল দূরত্বে সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক এবং কখনও কখনও বাণিজ্যিক সংযোগও সহজতর করেছিল।

সাংগঠনিক কাঠামো: সুফি তরিকাসমূহের গঠনতন্ত্র

সুফি তরিকাগুলো স্বতন্ত্র সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল যা ক্রমিক কর্তৃত্ব এবং সামাজিক অংশগ্রহণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করত। এই কাঠামোসমূহ আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান, মতবাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য একটি কাঠামো তৈরি করেছিল।

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক

প্রতিটি সুফি তরিকার মূলে রয়েছে আধ্যাত্মিক গুরু (যাকে বিভিন্নভাবে শায়খ, মুর্শিদ বা পীর বলা হয়) এবং শিষ্যের (মুরিদ) মধ্যকার সম্পর্ক। এই সম্পর্কটি নিছক শিক্ষাগত নির্দেশনার ঊর্ধ্বে, বরং এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক সংযোগের প্রতিনিধিত্ব

করে যার মাধ্যমে রহস্যময় জ্ঞান এবং আশীর্বাদ সঞ্চারিত হয়। সুফিবাদে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক সাধারণত আধ্যাত্মিক বিষয়ে পথপ্রদর্শকের কর্তৃত্বের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দাবি করে, যেখানে শিষ্যদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে তারা গুরুর নির্দেশাবলী বিনা প্রশ্নে অনুসরণ করবে। এই ক্রমিক সম্পর্কটি পারস্পরিক দায়বদ্ধতার একটি কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান। গুরু শিষ্যের আধ্যাত্মিক বিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, আর শিষ্য আনুগত্য, সেবা এবং অধ্যবসায়ী অনুশীলনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। এই আপাত কর্তৃত্ববাদী দিকটিকে অবশ্যই ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতির প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে, যেখানে রূপান্তরের পথে অহং-এর প্রতিরোধকে অতিক্রম করার জন্য শিক্ষকের কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণকে অপরিহার্য বলে মনে করা হয়।

অর্থনৈতিক ভিত্তি ও বস্তুগত সংস্কৃতি

সুফি তরিকাগুলো তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে সমর্থন করার জন্য স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক মডেল তৈরি করেছিল। ঐতিহাসিকভাবে, অনেক তরিকা ওয়াকফ, কৃষি সম্পত্তি, শিষ্য ও পৃষ্ঠপোষকদের দান এবং আয়-উৎপাদনকারী কারুশিল্প বা ব্যবসার সমন্বয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। এই অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা তরিকাগুলোকে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী সম্প্রদায়কে পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম করেছিল।

সুফি তরিকাগুলোর সাথে সম্পর্কিত বস্তুগত সংস্কৃতি—যার মধ্যে রয়েছে স্বতন্ত্র পোশাক, আচার-অনুষ্ঠানের সামগ্রী, ক্যালিগ্রাফিক শিল্প এবং বাদ্যযন্ত্র—তাদের ভৌত বাস্তবতার আরেকটি মাত্রা গঠন করে। এই বস্তুগত অভিব্যক্তিগুলো তরিকাগুলোর আধ্যাত্মিক পরিচয়কে প্রতিফলিত ও শক্তিশালী করে, যা বিমূর্ত অধিভৌতিক ধারণার সাথে চাক্ষুষ এবং স্পর্শযোগ্য সংযোগ তৈরি করে।

ধারণাগত ভিত্তি: সুফি তরিকাগুলোর বৌদ্ধিক স্থাপত্য

সুফি তরিকাগুলো জটিল ধর্মতাত্ত্বিক এবং অধিভৌতিক ভিত্তির উপর নির্মিত, যা ইসলামী গোঁড়ামির মধ্যে রহস্যময় অভিজ্ঞতা বোঝার জন্য বৌদ্ধিক কাঠামো প্রদান করে। এই ধারণাগত ব্যবস্থাগুলো ঐশ্বরিক একত্ব, আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব এবং ধর্মের গূঢ় ও প্রকাশ্য মাত্রার মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানতত্ত্ব: অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান

সুফি তরিকাগুলো একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে, যা তাত্ত্বিক উপলব্ধির চেয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে (মারিফা) প্রাধান্য দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি বৌদ্ধিক উপলব্ধির চেয়ে প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে বেশি মূল্য দেয়, যদিও এটি বৌদ্ধিক উপলব্ধিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে না। একটি সূত্র যেমন ইঙ্গিত করে, তরিকা বলতে বোঝায় "ঈশ্বর বা বাস্তবতার (হক্ক) প্রত্যক্ষ জ্ঞান (মারিফাহ) অর্জনের মুসলিম আধ্যাত্মিক পথ"।

সুফি অনুশীলন ও পদ্ধতি :

আধ্যাত্মিক সাধনার স্বতন্ত্র পদ্ধতিগুলোই সুফি তরিকাগুলোর কার্যকরী মূল ভিত্তি। এই অনুশীলনগুলো—নিয়ন্ত্রিত শ্বাসপ্রশ্বাস ও নড়াচড়া থেকে শুরু করে জপ ও ধ্যান পর্যন্ত—চেতনাকে রূপান্তরিত করার এবং ঐশ্বরিক বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে।

যিকির: আধ্যাত্মিক প্রযুক্তি হিসেবে স্মরণ

যিকিরের অনুশীলন (পুনরাবৃত্তিমূলক আহ্বানের মাধ্যমে ঈশ্বরের স্মরণ) কার্যত সকল সুফি তরিকার পদ্ধতিগত ভিত্তিপ্রস্তর গঠন করে। যদিও নির্দিষ্ট কৌশলগুলোতে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে, এর মৌলিক অনুশীলনে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা এবং চেতনাকে রূপান্তরিত করার উপায় হিসেবে ঐশ্বরিক নাম, ধর্মীয় মন্ত্র বা পবিত্র বাক্যাংশের পদ্ধতিগত পুনরাবৃত্তি অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিটি তরিকা সাধারণত যিকিরের স্বতন্ত্র রূপ বজায় রাখে, যেখানে পঠিত মন্ত্র, গৃহীত শারীরিক ভঙ্গি, ব্যবহৃত শ্বাসপ্রশ্বাসের কৌশল এবং অনুশীলনটি নীরবে নাকি সশব্দে করা হয়, তার মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। এই নির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলো তরিকার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে গুরু থেকে শিষ্যের কাছে হস্তান্তরিত হয়। ঐতিহ্য অনুসারে, "নবী [মুহাম্মদ] এই সম্মানিত ব্যক্তিদের দুটি ভিন্ন উপায়ে জিকির (আল্লাহর নাম জপ করার সুফি প্রথা) করতে শিখিয়েছিলেন। এই পদ্ধতিগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে এসেছে এবং এগুলোই সেই ভিত্তি যার উপর পরবর্তীতে সুফি তরিকাগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"

সামা: আধ্যাত্মিক সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং আনুষ্ঠানিক গতিবিধি

অনেক তরিকা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহায়ক চেতনার পরিবর্তিত অবস্থা প্ররোচিত করার উপায় হিসেবে সঙ্গীত, কবিতা এবং গতিবিধি জড়িত অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করে।

এই অনুশীলনগুলো—বিভিন্নভাবে সামা (শ্রবণ), হাদরা (উপস্থিতি), বা কিছু ক্ষেত্রে মেভলেভি তরিকার স্বতন্ত্র ঘূর্ণন ধ্যান নামে পরিচিত—সাধারণ চেতনাকে অতিক্রম করার জন্য ছন্দময় শব্দ এবং গতি ব্যবহার করে।

আধ্যাত্মিক নির্জনবাস: খালওয়া ও উজলা

আধ্যাত্মিক নির্জনতার অনুশীলন—যাকে বিভিন্নভাবে খালওয়া (নির্জনবাস) বা উজলা (একাকীত্ব) বলা হয়—অনেক তরিকায় প্রচলিত আরেকটি পদ্ধতিগত উপাদান। এই অনুশীলনগুলোতে একজন গুরুর নির্দেশনায় আধ্যাত্মিক সাধনায় নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করার জন্য সামাজিক মেলামেশা থেকে সাময়িকভাবে সরে আসা হয়। বিশ্রামের সময়, শিষ্যরা সাধারণত প্রার্থনা, উপবাস, জিকির এবং মননের নিবিড় কার্যক্রমে নিযুক্ত হন, যা রূপান্তরমূলক আধ্যাত্মিক অবস্থা অর্জনের জন্য পরিকল্পিত। নির্জনবাসের সময়কাল, পুনরাবৃত্তি এবং এর সাথে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট অনুশীলনগুলো বিভিন্ন তরিকায় ভিন্ন ভিন্ন হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক গভীরতা বৃদ্ধির জন্য সাময়িক নিভৃতবাসের মূল নীতিটি একই থাকে।

মুরাকাবা: ধ্যান ও মনন

মুরাকাবা, বা আধ্যাত্মিক ধ্যান, সুফিবাদের আরেকটি মূল অনুশীলন। এর মধ্যে ধ্যান ও মননের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক বিকাশ অন্তর্ভুক্ত। সুফিরা বিশ্বাস করেন যে অন্তর্মুখী হয়ে এবং ঐশ্বরিক সত্তার সঙ্গে গভীরতর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে, তাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ এবং ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করতে পারেন।

এই অনুশীলন বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে সাধিত হয়, যেমন শ্বাসের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা, নীরব ধ্যান, বা ঐশ্বরিক গুণাবলী নিয়ে চিন্তা করা। এর লক্ষ্য হলো মনকে শান্ত করা এবং ঐশ্বরিক উপস্থিতির জন্য হৃদয়কে উন্মুক্ত করা, যা আধ্যাত্মিক বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে।

রূপান্তরের পথ

উপরে উল্লিখিত সমস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে সুফি পথ আধ্যাত্মিক রূপান্তরের একটি পদ্ধতিগত পন্থা উপস্থাপন করে, যা একাধিক পর্যায় বা স্তর (মাকামাত) এবং পথিমধ্যে অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত বিভিন্ন অবস্থা (আহওয়াল)-কে কেন্দ্র করে গঠিত। এই স্তরগুলো সাধককে অবশ্যই অতিক্রম করতে হয়। এই উপাদানগুলো সুফি সাধনার

ভিত্তি তৈরি করে এবং ঐশ্বরিক উপলব্ধির দিকে অভ্যন্তরীণ যাত্রার জন্য একটি পথনির্দেশিকা প্রদান করে।

মাকামাত হলো নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক পর্যায় বা স্তর, যা একজন সুফিকে পরবর্তী স্তরে যাওয়ার আগে অবশ্যই অর্জন ও আয়ত্ত করতে হয়। অনুসন্ধান ফলাফলে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, "মাকাম (আরবি: امَمقَ
'স্তর'; বহুবচন ماتَ
বোঝায়) মাকামাত مقَا
ঈশ্বরের সন্ধানে একজন সুফির আত্মার অবশ্যই অর্জন করতে হবে এমন প্রতিটি পর্যায়"। এই স্তরগুলো
"একজন সুফিকে দৈনন্দিন জীবনে
যেসব সাধারণ বিষয় নিয়ে ভাবতে হয়, তা থেকে উদ্ভূত এবং এটি মূলত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ইসলামী আইন (শরিয়া) উভয়েরই মূর্ত রূপ"।

যদিও বিভিন্ন সুফি তরিকা এই স্তরগুলোকে ভিন্নভাবে বর্ণনা করতে পারে,
কিছু মূল স্তরের বিষয়ে সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো: "তাওবা, ওয়ারা',
যুহদ, ফকর, সবর, তাওয়াক্কুল এবং রিদা"।

এগুলোকে নিম্নোক্তভাবে বোঝা যেতে পারে:
১. তাওবা (অনুশোচনা): পাপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসার প্রাথমিক পর্যায়। আল-গাজ্জালীর বর্ণনা অনুযায়ী, তাওবা হলো "পাপের জন্য এই প্রতিজ্ঞা সহ অনুশোচনা করা যে, সেই পাপের পুনরাবৃত্তি হবে না এবং পাপী আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে"। এটি আধ্যাত্মিক যাত্রার সূচনা বিন্দুকে নির্দেশ করে।

২. ওয়ারা' (সতর্কতা): নৈতিক সতর্কতার এক উচ্চতর অবস্থা, যেখানে সাধক শুধু নিষিদ্ধ বিষয়ই নয়, বরং সন্দেহজনক বিষয়ও সতর্কতার সাথে পরিহার করেন।

৩. যুহদ (অনাসক্তি): বৈরাগ্য এবং পার্থিব আসক্তি ত্যাগের পর্যায়, যা হৃদয়কে আরও সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে।

৪. ফকর (আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য): আল্লাহর উপর নিজের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং জাগতিক বিষয় থেকে অনাসক্তির স্বীকৃতি।

৫. সবর (ধৈর্য): প্রতিকূলতা ও পরীক্ষার মুখে অবিচলতার অনুশীলন।

৬. তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর আস্থা): ঐশ্বরিক বিধানের উপর পূর্ণ নির্ভরতা, যা কখনও কখনও "এমন পর্যায়ে চর্চা করা হতো যে, আগামীকালের প্রতিটি চিন্তাকেই অধার্মিক বলে গণ্য করা হতো"।

৭. রিদা (সন্তুষ্টি): আল্লাহ যা কিছু নির্ধারণ করেছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকার অবস্থা, যা আত্মসমর্পণের এক গভীর স্তরকে প্রকাশ করে।

সুফি প্রতিষ্ঠানসমূহের আঞ্চলিক বন্টন ও জনমিতি
উত্তর আফ্রিকা ও মাগরেব
মাগরেব (মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া এবং লিবিয়া) অঞ্চলে জাওয়িয়ার এক বিশেষ সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, যা অন্যত্র সুফি প্রতিষ্ঠানগুলোর পতন ঘটলেও বিকাশ লাভ করতে থাকে। শুধুমাত্র আলজেরিয়াতেই, ১৯৬২ সালে স্বাধীনতার পূর্বে ১,৬০০-এরও বেশি জাওয়িয়া বিদ্যমান ছিল। পঞ্চদশ শতকে প্রতিদ্বন্দ্বী আমিরাতগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজনের সময়কালে ইসলামী শিক্ষা সংরক্ষণে এই প্রতিষ্ঠানগুলো অপরিহার্য ছিল:

"এই সংঘাতপূর্ণ মধ্য মাগরেবে, যা পরে আলজেরিয়ায় পরিণত হয়, কুরআনের শিক্ষা রক্ষার জন্য গ্রামের প্রথাগত কর্তৃপক্ষ প্রতিটি উপজাতি সংঘে জাওয়িয়া স্থাপন করে মুসলিম ধর্মবিশ্বাস রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে"।
আধুনিক উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে সুফিবাদের শক্তির প্রমাণ মেলে জনমিতি সংক্রান্ত তথ্য থেকে, যেখানে দেখা যায় বিপুল সংখ্যক মুসলিম সুফি প্রথার সঙ্গে

নিজেদেরকে যুক্ত করে। আনুমানিক ৯২% মুসলিম সুফি মতাদর্শের অনুসারী হওয়ায় সেনেগাল এক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে, এরপরে রয়েছে চাদ (৫৫%), ক্যামেরুন (৪৮%), নাইজার (৪৭%), এবং লিবিয়া (৯৮%)।
উসমানীয় সাম্রাজ্যে, সমগ্র অঞ্চল জুড়ে টেক্কে (সুফি আস্তানা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিশেষ করে ইস্তাম্বুলের মতো নগর কেন্দ্রগুলিতে এর ঘনত্ব বেশি ছিল।
সুফি লেখিকা সামিহা আইভার্দির মতে, "১৯২৫ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র ইস্তাম্বুলেই ৩৬৫টি দরগাহ (টেক্কে খানকাহ) ছিল। যদি এগুলোর প্রতিটিতে অন্তত পঞ্চাশ জন করে সদস্য থাকত, তাহলে মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়াত ১৮,২৫০ জন"১৪। যখন পরিবারের সদস্য এবং সমর্থকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯১,২৫০ জনে—যা তৎকালীন ইস্তাম্বুলের প্রায় ৮,০০,০০০ জনসংখ্যার প্রায় এক-অষ্টমাংশ।

উসমানীয় সাম্রাজ্য বিস্তারে টেক্কেগুলোর গুরুত্ব নতুন বিজিত অঞ্চলগুলোতে এদের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা থেকে সুস্পষ্ট। ওরহান গাজীর যুগে, ইস্তাম্বুল বিজয়ের প্রায় একশ বছর আগে, ইজমির উপসাগরের উত্তর তীরে টেক্কেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা উসমানীয় প্রভাব বিস্তারের জন্য "অগ্রবর্তী চৌকি" হিসেবে কাজ করত। ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর, অসংখ্য টেক্কে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে বাহচেকাপিতে শেখ মেহমেত গেয়লানি (বুরসা) টেক্কে, কানকুরতারানে আকবিয়িক টেক্কে এবং বেয়কোজে আকবাবা টেক্কে।

দক্ষিণ এশিয়া
ভারতীয় উপমহাদেশে একটি বিশেষভাবে প্রাণবন্ত সুফি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যেখানে দিল্লি একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর গ্রন্থ শিহাব আদ-দিন আল উমারির 'মাসালিক উল-আবসার ফি মাসালিক উল-আমসার' অনুসারে, দিল্লি এবং এর আশেপাশের এলাকায় ২,০০০-এরও বেশি খানকাহ ছিল। এই উল্লেখযোগ্য ঘনত্ব দক্ষিণ এশীয় ইসলামী সংস্কৃতিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কেন্দ্রীয় ভূমিকা প্রমাণ করে।

দক্ষিণ এশিয়ায় সুফি আস্তানাগুলোর জন্য বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহৃত হতো, যার মধ্যে ছিল "খানাকাহ," "জামাত-খানা," "তাকিয়া," "দরগাহ," "লঙ্গর," এবং কখনও কখনও "ইমারত"। প্রধান স্থাপনাগুলোর মধ্যে ছিল হাউজ-ই-আলাইয়ের কাছে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক কর্তৃক নির্মিত মাদ্রাসা-ই-ফিরোজশাহী, যা স্থাপত্যশৈলীতে এতটাই চিত্তাকর্ষক ছিল যে স্থানীয়রা এই কমপ্লেক্সের কাছাকাছি থাকার জন্য অন্যত্র চলে গিয়েছিল।

মধ্যপ্রাচ্য

সিরিয়া, মিশর এবং ইরাকে, বিশেষ করে আইয়ুবী ও মামলুক যুগে, নগরীর ধর্মীয় ভূদৃশ্যে খানকাহগুলো একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করত। দামেস্ক সম্পর্কে ইবনে জুবায়েরের দ্বাদশ শতাব্দীর বিবরণে সুফিদের জন্য নির্মিত অসংখ্য রিবাত (খানকাহ নামে পরিচিত) এর বর্ণনা রয়েছে, যেগুলোকে তিনি "জলের ধারা বয়ে চলা বিলাসবহুল প্রাসাদ" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

মিশরে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কায়রোতে সালাদিনের প্রথম খানকাহ প্রতিষ্ঠা সুফি প্রতিষ্ঠানগুলোর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার একটি নজির স্থাপন করেছিল, যা মামলুক যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। উত্তর আফ্রিকার মতো নয়, যেখানে গ্রামীণ জাওয়িয়াগুলোর প্রাধান্য ছিল, মিশরীয় খানকাহগুলো মূলত নগরীর ঘটনা ছিল এবং প্রায়শই রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোর কাছাকাছি অবস্থিত ছিল।

মধ্য এশিয়া

মধ্য এশিয়ায় সুফি সংঘের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, বিশেষ করে নকশবন্দী ধারার সাথে সম্পর্কিত, যার উৎপত্তি এই অঞ্চলেই। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য আধুনিক মধ্য এশীয় রাষ্ট্রগুলিতে মাঝারি আকারের সুফি জনসংখ্যা দেখায়: তাজিকিস্তান (১৮%), উজবেকিস্তান (১১%), কিরগিজস্তান (৭%), এবং কাজাখস্তান (১%)।

অধ্যায় ৩ : সুফিবাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা : সুফিবাদ ও শরীয়াহ

শরীয়াহর সাথে নবীর সম্পর্ক :
পৃথিবীতে নবীগণের মিশন হলো শরীয়াহর প্রচার করা। বিচার দিবসে আমাদেরকে শরীয়াহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, তাসাউফ সম্পর্কে নয়।
জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি শরীয়াহর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং, সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য নিহিত রয়েছে শরীয়াহর প্রচারের মধ্যে এবং এর অবহেলিত বিধানসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার মধ্যে, বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন এর আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতীকসমূহ (শায়ের) ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এমন সময়ে আল্লাহর পথে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করাও শরীয়াহর একটি বিধান পুনরুজ্জীবিত করার সমান নয়। কারণ শরীয়াহর বিধান প্রতিষ্ঠা করাই হলো নবীগণের কাজ সম্পন্ন করা।

মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো দাসত্বের (উবুদিয়্যাহ) কর্তব্য পালন করা, প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার করা, নিজের দীনতা ও নির্ভরশীলতা প্রকাশ করা এবং সর্বদা আল্লাহর দিকে ফিরে বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করা।
নবীর শরীয়াহ যে সেবার (ইবাদাহ) কথা বলে (মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে), তা মানুষের কল্যাণের জন্য এবং তার জীবনকে পরিপূর্ণ করার জন্য। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কল্যাণের জন্য মোটেই নয়। তাই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁর শরীয়াহ অনুসরণ করা, তাঁর আদেশ মান্য করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা উচিত।
শরীয়াহ, তরিকাহ ও হাকিকাহ
শরীয়াহর তিনটি অংশ রয়েছে: ঈমান (বিশ্বাস), আমল (কর্ম) ও ইখলাস (আন্তরিকতা);
যতক্ষণ না আমরা এই তিনটি অংশের চাহিদা পূরণ করি, ততক্ষণ আমরা শরীয়াহ পালন করি না। মানবজীবনের পরম লক্ষ্য হলো শরীয়াহ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর সন্তুষ্টি অর্জন করা।
তরিকাহ ও হাকিকাহ, যার জন্য সুফিরা পরিচিত, তা শরীয়াহর অধীন, কারণ এগুলো শরীয়াহর তৃতীয় অংশ, অর্থাৎ 'ইখলাস' উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। সুতরাং,

এগুলো শরিয়ত পূরণের উদ্দেশ্যেই এগুলোর অন্বেষণ করা হয়; শরিয়তের ঊর্ধ্বে কিছু অর্জন করার জন্য নয়। সুফিরা যে আবেগঘন অনুভূতি ও ভাবাবেগ লাভ করেন এবং তাদের যাত্রাপথে যে ধারণা ও সত্যগুলো তাদের কাছে আসে, সেগুলো সুফিবাদের লক্ষ্য নয়। তরিকাহ ও হাকিকাহ-এর স্তরগুলো অতিক্রম করার উদ্দেশ্য 'ইখলাস'-এর উপলব্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়, যার মধ্যে 'রিদা' বা 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি' অর্জন অন্তর্ভুক্ত। মূর্খরাই আবেগঘন অভিজ্ঞতা ও ভাবাবেগকে লক্ষ্যের অংশ মনে করে এবং দিব্যদর্শন ও আলোকপ্রাপ্তিকে (তাজাল্লিয়াত) চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করে। নিঃসন্দেহে, 'ইখলাস' ও 'রিদা'-এর উপলব্ধি এই অবস্থা ও অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্য দিয়ে যাওয়া এবং এই ধারণা ও সত্যগুলোকে উপলব্ধি করার উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু এগুলো একটি লক্ষ্যের উপায় ও গন্তব্যে পৌঁছানোর পথ, আর তা হলো যথাযথ ইখলাসের সাথে শরীয়াহ পালনের মাধ্যমে আপনার প্রভুকে সন্তুষ্ট করা।

শরীয়াহ ও মারিফা:

শরীয়াহর কর্তব্য নবীন এবং সিদ্ধ সুফি সাধক উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। এই বিষয়ে একজন সাধারণ মুসলিম এবং সবচেয়ে নিখুঁত জ্ঞানী ব্যক্তি একই। এরা হলো অপেশাদার সুফি। এরা হলো অপেশাদার সুফি এবং অযোগ্য ধর্মদ্রোহী, যারা শরীয়াহর জোয়াল ছুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করে এবং বলে যে শরীয়াহর নিয়মকানুন নবীনদের জন্য। তাদের দৃষ্টিতে, একজন সুফির জন্য যা প্রয়োজন তা হলো জ্ঞান (মারিফা) অর্জন করা, ঠিক যেমন আমির ও সুলতানদের জন্য প্রয়োজন ন্যায়বিচারের সাথে শাসন করা। তারা বলে যে শরীয়াহ মান্য করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা; ফলস্বরূপ, যখন জ্ঞান অর্জিত হয়, তখন শরীয়তের কর্তব্য হ্রাস পায়। এর সমর্থনে তারা কুরআনের এই আয়াতটি উদ্ধৃত করে – "তোমার রবের ইবাদত করো, যতক্ষণ না তুমি ইয়াকিন লাভ করো।" (১৫:৯৯) এই আয়াতটি ব্যবহার করে তারা বলতে চায় যে, আল্লাহর ইবাদতের কর্তব্য তখনই শেষ হয়ে যায়, যখন কেউ তাঁকে জানতে পারে এবং ইয়াকিন অর্জিত হয়। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হলো, যখন কেউ তাঁকে সত্যিকার অর্থে জানতে পারে, তখন 'দায়িত্বের' অনুভূতিটি অদৃশ্য হয়ে যায়, কারণ যখন কোনো বিষয়ে আপনার দৃঢ় ইয়াকিন থাকে, তখন আপনার বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করাটা আর বাধ্যবাধকতা বলে মনে হয় না, কাজটি

স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনায়াস বলে মনে হয়; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সেবাটিই ঝরে যায়। কারণ তা হবে চরম ধর্মদ্রোহিতা ও কুফর।

নবুওয়াহ ওয়ালায়াহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

সুফি সাধকদের মধ্যে কিছু লোক, যাদের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, তারা বিশ্বাস করে যে ওয়ালায়াহ, নুবুওয়াহর চেয়ে উত্তম এবং মনে করে যে শরীয়াহ, যা সত্তারও সত্তা, তা কেবল একটি খোলস মাত্র। এই লোকেরা শরীয়াহর কেবল বাহ্যিক রূপই দেখে এবং এর বাইরের খোলস ছাড়া এর বাস্তবতা সম্পর্কে কিছুই জানে না।

যেহেতু নুবুওয়াহ কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে ব্যক্তিগত বন্ধনের সাথেই সম্পর্কিত নয়, বরং দুনিয়ার সাথেও সম্পর্কিত, তাই তারা মনে করে যে এটি একটি নিকৃষ্ট বিষয়। কারণ তাদের লক্ষ্য হলো দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে একাত্ম হওয়া, যাকে তারা ওয়ালায়াহ বলে। একারণেই তারা মনে করে যে নুবুওয়াহ হলো ওয়ালায়াহর অভ্যন্তরীণ কিছু।

তাদের দৃষ্টিতে, নবীর দুনিয়া নিয়ে চিন্তা একজন সাধারণ মানুষের চিন্তার মতো; ফলস্বরূপ তারা এটিকে নিম্নতর এবং ওয়ালায়াহকে উচ্চতর মনে করে, যা হলো আল্লাহর প্রতি মনোযোগ। এবং তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ওয়ালায়াহ নুবুওয়াহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। দুনিয়ায় নবীগণের মিশন হলো পৃথিবীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হাকিমিয়্যাহ প্রতিষ্ঠা করা, এবং ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধি তারই একটি অংশ।

যিকির করা এবং অন্যান্য সকল পার্থিব দায়িত্ব থেকে নিবৃত্ত হওয়া।

মানুষ যা ভাবে তার বিপরীতে, যিকির শুধু 'নাফি ওয়া ইযবাত' (অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ') এর সূত্রটি পুনরাবৃত্তি করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে, শরীয়তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিটি কাজ, তা ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক, তা হলো আল্লাহকে স্মরণ করা। নিঃসন্দেহে, যে যিকিরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নাম ও গুণাবলী উচ্চারণ করা হয়, তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টিতে অধিক কার্যকর ও সহায়ক। এটি শরীয়তের পালন আরও সহজে অর্জন

করার একটি ওয়াসিলা, কারণ যখন আপনার মধ্যে ভালোবাসা থাকে, তখন ভালোবাসার খাতিরে কিছু করা সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু পার্থিব দায়িত্ব পালন করা, এমনকি তা কেনাবেচার মতো সাধারণ কাজ হলেও, শরীয়ত অনুযায়ী তা-ও যিকিরের একটি রূপ। কারণ যিকিরের অর্থ হলো সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করা।
সুতরাং, জীবনের সকল কাজে শরীয়তের নিয়মকানুন মেনে চলাই যিকির হয়ে যায়।

অধ্যায় ৪ : উপসংহার

আজকের বিশ্বে আমরা কীভাবে ভারসাম্যপূর্ণ তাসাউফ অনুশীলন করতে পারি যেহেতু সুফি দ্বৈতবাদ দূর করতে চান, তাই তিনি সর্বদা এক ধরনের আবেশে থাকেন। কিন্তু যেহেতু নবুয়তি ধার্মিকতা দ্বৈতবাদকে বিলুপ্ত করে না, তাই এটি আবেশকে জানে না: এটি হলো পূর্ণ সংযম (সাহু)।

যেহেতু ওয়ালায়াত ব্যক্তি ও ঈশ্বরের মধ্যেকার দ্বৈতবাদের বিলোপ দাবি করে, তাই সাধক তার নিজের ইচ্ছা, তার গুণাবলী এবং তার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। নবুয়তি পথে, যেহেতু লক্ষ্য দ্বৈতবাদ বিলোপ করা নয়, তাই এই পথে চলার জন্য তার ইচ্ছাকে অস্বীকার করার, কিংবা তার গুণাবলী ও তার সত্তাকে নির্মূল করার প্রয়োজন হয় না। তাকে যা করতে হয় তা হলো তার ইচ্ছার মন্দ বস্তুগুলোকে সরিয়ে দিয়ে সেগুলোর জায়গায় ভালো বস্তু স্থাপন করা।

ঈশ্বরের প্রতি সুফিদের ভালোবাসা এক তীব্র ভালোবাসা: এটি নিজেকে বিলীন করে ঈশ্বরের মধ্যে মিশে যেতে চায়; আর তা না ঘটলে সুফি কাঁদে, বিলাপ করে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এবং এমন সব কাজে লিপ্ত হয় যা আত্মবিসর্জন ও ভাবাবেশ এনে দেয়, যেমন সঙ্গীত ও নৃত্য।

কিন্তু নবুয়তি প্রেম সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রেম; এটি বিচ্ছেদের আর্তনাদ, মিলনের দীর্ঘশ্বাস, ভাবাবেশ এবং আত্মত্যাগের বিষয়ে অজ্ঞ, যা পূর্ববর্তী প্রেমের বৈশিষ্ট্য।

ওয়ালায়াত অনুসারে, সুফিকে এই দুনিয়া ও পরকাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হয় এবং বিশ্বাস করতে হয় যে পরকালের (আখিরাহ) অন্বেষণ করা এই দুনিয়ার অন্বেষণের চেয়ে উত্তম নয়। শায়খ আহমদ সিরহিন্দি দাউদ আল-তাই (মৃত্যু: ১৬৬ হিজরি/৭৮২ খ্রিস্টাব্দ)-এর এই উক্তিটি উল্লেখ করেন: "যদি নিরাপত্তা চাও, তবে দুনিয়াকে বিদায় দাও; কিন্তু যদি সম্মান চাও, তবে পরকালকে বিদায় দাও।"

তিনি রাবিয়াহ আল-আদাউইয়াহ (মৃত্যু: ১৮৫ হিজরি/৮০১ খ্রিস্টাব্দ)-এর সেই উক্তিটিও উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি জান্নাতের ভালোবাসার বিপরীতে আল্লাহর ভালোবাসাকে দাঁড় করিয়েছেন এবং জান্নাতকে পুড়িয়ে ফেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

ওয়ালায়াত-এ সুফি বিভিন্ন রূপ ও আলোকচ্ছটার (যুহুরাত ওয়া তাজাল্লিয়াত) সম্মুখীন হন। তিনি বিভিন্ন আকার ও আকৃতি, রঙ ও আলো দেখেন,

বিশেষ করে তাঁর সুলুক-এর প্রথম পর্যায়ে এবং তিনি তাঁর দর্শন নিয়ে আবিষ্ট থাকেন।

কিন্তু নবুয়তের পথের পথিক প্রায় কোনো দর্শনই দেখেন না,

এমনকি তাঁর কর্মজীবনের শুরুতেও নয়; এবং তাঁর সেগুলোর প্রয়োজনও হয় না। কারণ,

এই দর্শনগুলো পরম সত্তার ছায়া ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং নবুয়তের পথের পথিকের 'ছায়ার প্রতি কোনো ভালোবাসা নেই', এবং তিনি আলোকচ্ছটার (তাজাল্লি) বন্দী নন।

উৎস/তথ্যসূত্র

1. The Institutional legacy of Sufism
2. .https://ghayb.com/exploring-the-ultimate-aims-of-sufism/
3. Let's Talk Religion
4. .https://ghayb.com/the-reality-of-sufism/
5. https://ghayb.com/the-evolution-of-sufism/
6. https://ghayb.com/2015/11/the-scholars-on-tassawwuf-throughout-history/
7. Rasulullah's Sufism of Balance by Shaykh Abdullah
8. Comprehensive exploration of sufi orders
9. 16.https://en.islamonweb.net/imam-al-ghazalis-perspective-on-sufismintegrating-shariah-spirituality-and-ethics
10. https://en.islamonweb.net/imam-al-ghazalis-perspective-on-sufism-integrating-shariah-spirituality-and-ethics